গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৬ বর্ষ ৩২ সংখ্যা ২৬ মার্চ, ২০০৪ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

অর্থমন্ত্রীর বাজেট ভেল্‌কি

সামনেই নির্বাচন। কাজেই প্রত্যাশিতভাবে নতুন কোন করপ্রস্তাব ছাড়া ২০০৪-২০০৫ সালের জন্য ৯২ কোটি টাকার ঘাটতি সমেত রাজ্য বাজেট পেশ করেছেন অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত। ৩৬,৮০৬ কোটি টাকার বাজেটে ৯২ কোটি টাকার ঘাটতিটা বড় কথা নয়। খবরও নয়। তাহলে অর্থনীতিবিশারদ অর্থমন্ত্রীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কী আছে বাজেটে? অসীমবাবুর নিজস্বতা, অবশ্যই শাসক সি পি এমের অনর্গল মিথ্যাভাষণের ধারা অনুসরণ করে, ফুটে উঠেছে দু'টি বৈশিষ্ট্যে।

১। শিল্প-কৃষি-শিক্ষা-স্বাস্থ্য — সর্বক্ষেত্রেই পশ্চিমবঙ্গ যে ভারতের মধ্যে সেরা, বা সেরাদের একজন — এটা দেখাতে তিনি যাদুকরের মতো সব ভুঁইফোঁড় পরিসংখ্যান পেশ করেছেন। মাতৃপিতৃহীন এসব পরিসংখ্যানকে ঋষিবাক্য বলে মানতে হবে। জনগণের জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলালে চলবে না।

২। বাজেটের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল উপস্থাপনার ভঙ্গি। কোথায় কতটুকু না বলে চেপে যেতে হবে; কী কৌশলে বললে ১০-কে ২০-র চেয়েও বড় সংখ্যা প্রতিপন্ন করা যাবে — এটা তিনি পেশাদারি দক্ষতার সঙ্গে করেছেন। ধুতির ছেঁড়া ফাটা অংশ কাছা-কোঁচার ভাঁজে কী করে ফেলতে হয় তা পাকা হাতে দেখিয়েছেন।

বাজেটের শুরুতে নান্দীপাঠ, আচমন, আসনশুদ্ধির মতো 'একচেটিয়াত্ব' কমানো, 'প্রতিযোগিতা' বাড়ানো, 'কর্মসংস্থান বৃদ্ধি', 'কৃষিতে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি' ইত্যাদি বাঁধা মন্ত্র পড়ে ''জনগণায় স্বাহাঃ'' বলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এগুলো করা হচ্ছে কোথায়, কীভাবে — বাজেটে তার হদিশ নেই।

কর্মসংস্থান

যেমন ধরুন কর্মসংস্থান। রাজ্যের জনগণের এটা একটা বড় সমস্যা। অর্থমন্ত্রী বলেছেন — কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সংস্কার ''কার্যসূচির সঙ্গে আমাদের বিকল্প নীতি ও আর্থিক সংস্কারের কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে।'' কোথায় পার্থক্য? অর্থমন্ত্রী বলেছেন — কেন্দ্রীয় কর্মসূচিতে ''কর্মসংস্থান বৃদ্ধিকে মূল সামাজিক লক্ষ্য হিসাবে রাখা হয়নি''। ফলে, ''ভারত সরকারের সর্বশেষ প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী শুধুমাত্র নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যাই সমগ্র দেশে এখন ৪ কোটিকে অতিক্রম করে গেছে।'' এ পর্যন্ত কথা সত্য। কিন্তু, তাঁদের বিকল্প নীতিতে রাজ্যের বেকার সমস্যা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে — এ নিয়ে মুখ খোলা তিনি বিপজ্জনক বুঝে চেপে গিয়েছেন।

বাস্তব হল ২০০৩ সালের অক্টোবরে এ-রাজ্যে নথিভুক্ত বেকার সংখ্যা হল ৬৬,৬৭,০০০ যা আগের বছরের (৬৩,৩০,০০০) তুলনায়

সাতের পাতায় দেখুন

কোথায় গেল মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ?

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যখন সর্বত্র ম্যাকিন্‌সে ধাঁচে চাষীদের উপদেশ দিচ্ছেন ধানের মতো প্রথাগত শস্যের চাষ না করে টমেটো, তৈলবীজ সহ অন্যান্য প্রথাবহির্ভূত ফসলের চাষ করার জন্য, ঠিক তখনই উত্তরবঙ্গের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের চাষীরা মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন টমেটো চাষ করে। ধার দেনা করে ভাল মানের সার, রাসায়নিক ও কীটনাশক দিয়ে এবছর টমেটোর ভালই ফলন পেয়েছিলেন চাষীরা। কিন্তু দাম পেলেন না একেবারেই। উত্তরবঙ্গের অন্যতম বৃহৎ পাইকারি বাজার হলদিবাড়ি বাজারে টমেটো বিকোচ্ছে ১৫ থেকে ২৫ পয়সা কেজি দরে। এই দামে চাষের খরচ তো দূরের কথা, ফসল বাজারে নিয়ে আসার খরচটুকুও উঠছে না। ঋণের হাত থেকে রেহাই পেতে হয়তো আবারও কোন রবীন্দ্রনাথ ঘোষের নাম কোনদিন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হবে।

বামফ্রন্টের নেতা-মন্ত্রীরা আজ যখন চাষীদের প্রতি দরদে বিগলিত-অশ্রু, তখন সরকারের কৃষি দপ্তর, কৃষি বিপণন দপ্তর এ সবের খোঁজই রাখে না। কলকাতা শহরের বাজারে বাজারে

সাতের পাতায় দেখুন

ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের এক বছর

২০ মার্চ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দিবসে

দেশে দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষের বিক্ষোভ

আমেরিকার ২৫০টি শহরের সাথে নিউ ইয়র্কেও লক্ষ মানুষের বিক্ষোভ

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় বিক্ষোভ

স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে বিক্ষোভ

আরও ছবি আটের পাতায়

বাঙ্গালোরে বিদ্যুৎ কর্মী কনভেনশন

বিজেপি পরিচালিত এন ডি এ জোট সরকারের উদ্যোগে এবং কংগ্রেস, তৃণমূল সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থনে সংসদের উভয় সভায় পাশ হয়ে বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ সারা দেশের বিদ্যুৎ কর্মী ও গ্রাহকদের সামনে চরম বিপদ হিসাবে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু এই আইন পাশ হওয়ার বহু আগেই বিভিন্ন রাজ্যে বিদ্যুৎ পর্ষদকে বিলুপ্ত করে বেসরকারীকরণের সর্বাত্মক প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায় সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলির উদ্যোগে, কর্ণাটক যার অন্যতম। এই রাজ্যের বিদ্যুৎ পর্ষদকে বিলুপ্ত করে ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের পক্ষে শুরু হয়েছে ব্যাপক কর্মযজ্ঞ। বিভিন্ন বেসরকারি কোম্পানিকে দেওয়া হয়েছে বিদ্যুৎ শিল্প পরিচালনার দায়িত্ব। এই সমস্ত বেসরকারী কোম্পানিগুলি বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগ করে তাদের উপর চালিয়ে যাচ্ছে মধ্যযুগীয় শোষণ।

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী দীর্ঘদিন কর্ণাটকে বিদ্যুৎ শিল্পের বেসরকারীকরণ ও কর্মীদের উপর সীমাহীন বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াই সংগঠিত করছে। যার ধারাবাহিকতায় গত ১২ মার্চ কে পি টি সি এল এসকম্‌স ঠিকাকর্মী ইউনিয়নের উদ্যোগে বাঙ্গালোর শহরের এন জি ও হলে এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনের আগে এক সুসজ্জিত মিছিল চিক্‌লাবাগ থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এন জি ও হলে উপস্থিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সংশ্লিষ্ট ঠিকাকর্মীরা বণ্টনবিভাগে নিয়োজিত এবং বিল প্রস্তুতির কাজের সাথে যুক্ত। কাজটি পুরোপুরি স্থায়ী ধরনের হওয়া সত্ত্বেও, এদের প্রতি মাসে মাত্র ১৫০০ - ২০০০ টাকা বেতন দেওয়া হয়। অন্যান্য অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা সহ অবসরকালীন কোনও প্রাপ্যই এদের দেওয়া হয় না।

কনভেনশনের শুরুতেই বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের আহ্বায়ক এবং ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর কর্ণাটক রাজ্য কমিটির সম্পাদক

কমরেড সোম শেখর।

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর কর্ণাটক রাজ্য কমিটির সভাপতি কমরেড রাধাকৃষ্ণণ বলেন, অধিকাংশ ট্রেড ইউনিয়ন চরম সুবিধাবাদী রাস্তা গ্রহণ করায় আমাদের দেশে শ্রমিক-কর্মচারীদের কোনও কার্যকরী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে উঠছে না। এই পরিস্থিতিতে যথার্থ সংগ্রামী ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য উপস্থিত প্রতিনিধিদের প্রতি তিনি আহ্বান জানান।

অল ইন্ডিয়া পাওয়ারমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড সমর সিন্‌হা বলেন যে, বিদ্যুৎ বর্তমান সমাজজীবনে একটি অপরিহার্য এবং সমস্ত শিল্পের শিল্প। কিন্তু বিজেপি পরিচালিত এন ডি এ জোট সরকার দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের স্বার্থে বিদ্যুৎ আইন '০৩ প্রণয়ন করে বিদ্যুৎকে পণ্যে পরিণত করতে চাইছে। এই দানবীয় আইন পাশ হওয়ার বহু আগেই বিভিন্ন রাজ্য সরকার নিজস্ব উদ্যোগে বিদ্যুৎ পর্ষদকে বিলুপ্ত করে বেসরকারীকরণের পক্ষে কর্মযজ্ঞ শুরু করেছে। এ বিষয়ে পশ্চিমবাংলার সি পি এম পরিচালিত ফ্রন্ট সরকার ব্যতিক্রম তো নয়ই, বরং বহুক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে এবং এখনও করছে। বিদ্যুৎ শিল্পে বেসরকারীকরণের ফলে বিভিন্ন রাজ্যে কর্মচারী ও গ্রাহকদের উপর যে ব্যাপক আক্রমণ নেমে এসেছে তার বিভিন্ন দিক তিনি তথ্য সহ উল্লেখ করেন। সেজন্য অর্থনৈতিক ও অন্যান্য দাবির সাথে নিম্নোক্ত দাবিগুলির ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য উপস্থিত প্রতিনিধিদের প্রতি তিনি আহ্বান জানান ঃ

(১) সরকারকে ঘোষণা করতে হবে যে, বিদ্যুৎ একটি অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা এবং একে পণ্য করা চলবে না, (২) বিদ্যুৎকে জনগণের মৌলিক অধিকার হিসাবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে, (৩) বিদ্যুৎ পর্ষদের বিভাজন ও বেসরকারীকরণের পদক্ষেপ বন্ধ করতে হবে এবং ইতিমধ্যে বিভাজিত বিদ্যুৎ পর্ষদগুলোকে পূর্বের মূল কাঠামোয় ফিরিয়ে আনতে হবে।

কমরেড সিন্‌হা বলেন যে, উপরোক্ত দাবিগুলি আদায় করা সম্ভব যদি সারা দেশের ১২ লক্ষ বিদ্যুৎ কর্মী, ১০ কোটি গ্রাহকের সাথে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। সেজন্য বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলে হাতে হাত মিলিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য উপস্থিত প্রতিনিধিদের প্রতি তিনি আহ্বান জানান।

অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন বাঙ্গালোর শহরের বিশিষ্ট আইনজীবী কে সুব্বারাও এবং অল ইন্ডিয়া এম এস এস-এর সাধারণ সম্পাদিকা কমরেড এইচ জি জয়লক্ষ্মী।

টু হুইলার্স
মিছিল ও ডেপুটেশন

গত ২৩ ফেব্রুয়ারি টু হুইলার্স ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের ফালাকাটা শাখার উদ্যোগে টু হুইলার্স ওনাররা গাড়ি নিয়ে হর্ন বাজিয়ে মিছিল করে শহর পরিক্রমা করে বি ডি ও অফিসে ডেপুটেশন দেন। ডেপুটেশনে ধোঁয়া-পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন, লাইফটাইম ট্যাক্স বাতিল সহ কয়েকটি দাবি জানানো হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন সভাপতি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি রামনারায়ণ সাহা ও সম্পাদক প্রলয় সরকার।

সি ই এস সি'তে ডেপুটেশন

বেআইনি লাইনকাটা, ভুতুড়ে বিল ও লোডশেডিং সহ সি ই এস সি'র নানাবিধ অত্যাচারের বিরুদ্ধে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স এ্যাসোসিয়েশন-এর মধ্য কলকাতা কমিটির পক্ষ থেকে প্রায় সহস্রাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহকদের স্বাক্ষর সম্বলিত দাবিপত্র নিয়ে ১৮ মার্চ সি ই এস সি'র জেনারেল ম্যানেজার (এল টি)-কে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স এ্যাসোসিয়েশনের লেনিন সরণী, তালতলা ও ৫১নং ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি ও সম্পাদকবৃন্দ — প্রশান্ত কুমার নন্দী, নাসিম রাজা, বিমলকৃষ্ণ মন্ডল, মানস মুখার্জী ও জয়মাতাদি ট্রেডার্স এ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিজয়কুমার সাউ সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অ্যাবেকার জেলা কমিটির পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন শিবাজী দে, ভারতী মৈত্র ও স্বপন চ্যাটার্জী প্রমুখ।

জলপাইগুড়ি

ফালাকাটা বিদ্যুৎ দপ্তর ঘেরাও করে দাবি আদায়

জলপাইগুড়ি জেলার ফালাকাটা ব্লকের বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দাদের বিদ্যুতের বিল এসেছে ৮০-৯০ হাজার টাকা পর্যন্ত। এর প্রতিবাদে দুই শতাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহক ২০ ফেব্রুয়ারি বিদ্যুৎ দপ্তরের এস এম-কে ঘেরাও করেন ও কাউন্টার অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। পুলিশ এসে ঘেরাওকারীদের হঠাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। এস এম এবং জুনিয়র ডিভিশনাল ম্যানেজার তাদের ভুল স্বীকার করে বিলগুলি সংশোধন করার এবং সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত বিল কালেকশন বন্ধ রাখা ও লাইন না কাটার লিখিত প্রতিশ্রুতি দিলে গ্রাহকরা ঘেরাও তুলে নেন।

২৫ ফেব্রুয়ারি অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার পুলিশ পাহারায় বিল কালেকশন শুরু করলে বিদ্যুৎ গ্রাহকরা অফিসে জমায়েত হয়ে এ ই-কে বাধ্য করে কাউন্টার বন্ধ করতে। আলিপুরদুয়ার থেকে ছুটে আসেন ডি ই। তিনি অ্যাবেকার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনায় বসেন এবং সিদ্ধান্ত হয় বিদ্যুৎ বিভাগের ৩ জন ও অ্যাবেকার ৩ জন প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত কমিটি ভুতুড়ে বিল সংশোধন করে দেবে। মাসিক বিদ্যুৎ ব্যবহারের ভিত্তিতে গ্রাহকদের 'ট্যারিফ বেনিফিট' দেওয়া হবে, ২০০১ সালের দাম অনুযায়ী মূল্য নির্ধারণ করা হবে, অধিক পরিমাণ বিলের ক্ষেত্রে ২০০১-এর পূর্বের হারে দাম নির্ধারণ করা হবে, ১২টি কিস্তিতে গ্রাহকরা তা পরিশোধ করবেন। আরও সিদ্ধান্ত হয় সমস্ত অবাঞ্ছিত বিল ১৫ মার্চের মধ্যে অফিসে বা সমিতিতে গ্রাহকদের লিখিত বক্তব্য সহ জমা দিতে হবে। আন্দোলনের এই জয় অ্যাবেকার প্রতি এলাকার মানুষের আস্থা ও নির্ভরশীলতা অনেকগুণ বাড়িয়েছে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে সভা

জবলপুর

নারীসমাজের ওপর ক্রমবর্ধমান আক্রমণ, মহিলাদের গ্রেপ্তারি সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায়, সংসদে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স বিল পেশ করা এবং রাজস্থানের রূপ কানোয়ার হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্তদের মুক্তি প্রভৃতি পদক্ষেপ এদেশে নারীর নিরাপত্তাকে ধ্বংস করে তাদের প্রতি অত্যাচার বাড়াতেই সাহায্য করবে — বললেন সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সংযোজক কমরেড চন্দ্রা পাত্র। গত ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে জবলপুরে কাঁচঘরে অবস্থিত সংগঠনের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় সম্পাদিকা গোপা ভট্টাচার্য দিনটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। ঐ দিন প্রধানমন্ত্রী এবং মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে লিখিত একটি স্মারকলিপি সভায় গৃহীত হয় এবং পরদিন ৯ মার্চ তা জেলাশাসকের কাছে পেশ করা হয়।

কলকাতা

সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের কলকাতা জেলার উদ্যোগে ৮মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে মহিলাদের একটি মিছিল ধর্মতলায় মেট্রো স্টেশনের সামনে এক জনসভায় মিলিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী কমরেড সাধনা চৌধুরী। মহিলাদের গ্রেপ্তারি সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায়, মদের ঢালাও লাইসেন্স এবং ৬ মার্চের গণধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে প্রস্তাব উত্থাপন করেন কমরেডস্ অতসী মুখার্জী, বুলবুল আইচ, রুণা পুরকাইত এবং সমর্থনে বক্তব্য রাখেন কমরেডস্ রমা মুখার্জী, মমতাজ জাহেদ, অনিতা সেনগুপ্ত ও রাধা মিত্র। সভার শুরুতে বক্তব্য রাখেন কলকাতা জেলার পক্ষে কমরেড প্রণতি কর, রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড হাসি হোড়। সমাবেশে বিশেষ অতিথি ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভানেত্রী কমরেড ছায়া মুখার্জী। তিনি ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখান যে, চিরদিন মেয়েরা বর্তমান পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মত দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে বিবেচিত হতেন না। তিনি বলেন, উপযুক্ত শিক্ষা, সুযোগ পেলে মহিলারাও চেতনায় এবং কর্মক্ষেত্রে পুরুষের সমকক্ষ হতে পারেন। সবশেষে সভানেত্রী কমরেড সাধনা চৌধুরী আন্তর্জাতিক নারী দিবসে শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার অঙ্গীকার গ্রহণ করার আবেদন জানান।

মদের লাইসেন্সের প্রতিবাদে রূপনারায়ণপুরে যুব বিক্ষোভ

বর্ধমান জেলার রূপনারায়ণপুরে রাজ্য সরকারের ঢালাও মদের লাইসেন্স বিতরণের প্রতিবাদে ডি ওয়াই ও-র উদ্যোগে গত ৫ মার্চ এক যুব বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। যুবক-যুবতীদের একটি সুসজ্জিত মিছিল স্থানীয় বাজার ও বাসস্ট্যাণ্ড এলাকা পরিক্রমার পর মদের বোতলের একটি বিশালাকার প্রতিরূপ দাহ করা হয়। মাধ্যমিক পরীক্ষার কথা মাথায় রেখে বিক্ষোভের শুরুতে সংগঠনের পক্ষে কমরেড অর্ণব ব্যানার্জী সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, একদিকে মদের ঢালাও লাইসেন্স দিয়ে রাজস্ব বাড়ানোর চেষ্টা, অপরদিকে পুঁজিপতিদের প্রায় ৬০০০ কোটি টাকা ছাড় দেওয়া — এটাই প্রমাণ করে যে রাজ্য সরকার আজ মালিকদের সেবাদাসে পরিণত হয়েছে। তাঁর আরও অভিযোগ, মদের ঢালাও লাইসেন্স দেওয়ার সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের শুধু অর্থনৈতিক নয়, সাংস্কৃতিক দেউলিয়াপনারও পরিচয়। এর ফলে রাজ্যে স্বদেশি আন্দোলনে ও বামপন্থী আন্দোলনে মাদকদ্রব্য বিরোধী যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল তা ধ্বংসের চেষ্টা চলছে।

বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে

নারী নির্যাতন ও প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রস্তুতি

নারী প্রগতি নিয়ে খুবই হৈ চৈ হচ্ছে। লোকসভা, বিধানসভা, পঞ্চায়েত ও পৌরসভায় মহিলা প্রতিনিধিত্ব নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার, বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলি, এমনকি সি পি এম চালিত রাজ্য সরকারও বিশেষভাবে তৎপর। কংগ্রেসও কম সোচ্চার নয়। আইন করে নারীর অধিকার রক্ষার এক অদ্ভুত প্রতিযোগিতা চলছে। সমাজে নারীর অধিকার যত লুপ্ত হচ্ছে, নিরাপত্তার অভাব যত বাড়ছে, নারী পাচার- ধর্ষণ-বধূহত্যা ও পেশাগত ক্ষেত্রে নারীর নানা ধরনের নির্যাতন যত বাড়ছে, হিন্দু ও মুসলিম উভয় ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ যত বাড়ছে — এসব সমস্যা নিরসনে বক্তৃতাও তত বাড়ছে। ধর্ম ও বর্ণের কারণেও নারী হত্যা ও নির্যাতন বিস্ময়কর মাত্রায় বাড়ছে স্বাধীনতার এত বছর পরেও। বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের মত অপরাধও ঘটে চলেছে অবিরাম।

অবিভক্ত বাংলায় রেনেশাঁসের পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায় বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। দেশের অভ্যন্তরে জনমত গড়ে তোলার ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধেই তাঁর লড়াই ছিল ১৮ বছর। বিধবা বিবাহের সপক্ষেই তিনি তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। সম্পত্তির উপর নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যও তিনি তীব্র সংগ্রাম করেছেন। তাঁর প্রধান আকাঙ্ক্ষা ছিল, পৌত্তলিকতা ও জাতি-বর্ণ ভেদাভেদ দূর করে ঐক্যবদ্ধ আধুনিক ভারতীয় জাতি গড়ে তোলা, যে জাতি রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারবে।

সতীদাহের মত বর্বর হত্যাকান্ডে কত নারীর প্রাণ গিয়েছিল তা অনুমান করার জন্য শুধু মুর্শিদাবাদ জেলার একটি হিসেবই যথেষ্ট হবে। ১৮১৮ থেকে ১৮২৮ পর্যন্ত প্রতি বছর গড়ে এই একটি জেলাতেই ১০০ জন নারী সহমরণে যেতে বাধ্য হত। রামমোহনের আন্দোলনের ফলে ১৮৩২ সালে এই হত্যাকান্ড রোধ হয়। বিধবাদের পিতামাতা যা পারেনি — এই সামাজিক আন্দোলন তা পেরেছিল।

নারীর স্বাতন্ত্র্য ও অধিকারের যে দাবি সমাজ-আকাঙ্ক্ষা রূপে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল, রামমোহনই তাকে একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক চেতনা ও আন্দোলনে রূপ দেন। প্রকৃতপক্ষে রামমোহনের কণ্ঠেই আমাদের দেশে প্রথম নারী অধিকার রক্ষার ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছিল। নারী মুক্তি আন্দোলনের সেটাই শুরু।

ইউরোপের মানবতাবাদী ভাবধারার যে ঢেউ এদেশে এসে পৌঁছেছিল এবং অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার গর্ভেই বিরুদ্ধ শক্তি (anti-thesis) হিসাবে বণিকী পুঁজির যে বিকাশ ও বিস্তৃতি ঘটেছিল, তার ভিত্তিতেই এদেশে রামমোহনের চিন্তার স্ফূরণ ঘটে। তিনি ধর্মের কাঠামোর মধ্যেই যতদূর সম্ভব বিচারমূলক যুক্তিবদ্ধ ও মানবকেন্দ্রিক মূল্যবোধ আনার চেষ্টা করেছিলেন। বিদ্যাসাগর এসে এই জায়গায় চিন্তার ক্ষেত্রে ছেদ ঘটালেন। তিনি ধর্মীয় প্রভাব থেকে তাকে মুক্ত করলেন এবং ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদের ভিত্তিতে সমাজে ঝড় তুললেন। বাল্যবিবাহ, বহু বিবাহ রোধ করা, বিধবা বিবাহ চালু করা, সম্পত্তির উপর নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, আধুনিক শিক্ষার প্রসার ও নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, ধর্মনিরপেক্ষ বৈপ্লবিক মানবতাবাদী এই চিন্তাচেতনার প্রসার ও প্রতিষ্ঠা শেষপর্যন্ত জয়যুক্ত হতে পারেনি হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনের চাপে।

মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের বিশ্লেষণে পাওয়া যায় — মানবতাবাদী ভাবধারার ভিত্তিতে এদেশে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের যে ঝান্ডাটিকে উর্ধে তুলে গেলেন রামমোহন থেকে শুরু করে বিদ্যাসাগর, শরৎচন্দ্র, নজরুল — রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতারা, এমনকি সাম্যবাদী বলে পরিচিত দলটিও সেই ঝান্ডা বহন করার কাজটিকে অবহেলা করে। ফলে স্বাধীনতা শেষপর্যন্ত এলেও, একদিকে স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব পুঁজিপতিশ্রেণীর হাতে থাকার ফলে তার সমস্ত ফল চলে গেল পুঁজিপতিশ্রেণীর হাতে, অন্যদিকে দেশ রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হলেও সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে দেশের জনগণ বিভক্ত হয়ে রইল ধর্ম, বর্ণ, জাতি বৈষম্য, জাতপাতকে ভিত্তি করে।

এ কারণে স্বাধীনতার এত বছর পরেও বহুবিবাহের প্রকোপ অবাক করার মত — হিন্দুদের মধ্যে ৫.০৬%, মুসলিম ৪.৩%, বৌদ্ধ ৮.১৩%, জৈন ৪.৪%। আর বাল্যবিবাহ? অগণিত — যা সামন্তী সংস্কৃতির বিয়োগান্ত নিদর্শন। ২০০০ সালে 'স্টেটসম্যান' কাগজে একটা ভয়াবহ ও মর্মান্তিক সংবাদ পরিবেশিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের একটি প্রোজেক্ট বিশিষ্ট একজন অধ্যাপক পরিচালনা করে রিপোর্টে দেখান, শুধু ঐ একটা বছরেই ২০,০০০ মেয়ে — যারা আমাদের ঘরের মেয়ে, বয়স ১৩ থেকে ১৯ — কলকাতায় দেহ ব্যবসায় লিপ্ত হয়েছে। তারা এসেছিল মুর্শিদাবাদ এবং কিছু বাংলাদেশ ও নেপাল থেকে। এসেছিল শুধু দু'টো ভাত-কাপড়ের জন্য। জবালা অ্যাকশন রিসার্চ অর্গানাইজেশন (JARO) ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩-এর 'স্টেটসম্যান' কাগজে যে সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশ করেছে তাতে বলছে, দেহব্যবসায়ীদের ৮০ শতাংশ এসেছে মুর্শিদাবাদ থেকে। জেলাশাসক মনোজ পন্থও স্বীকার করেন, নারী পাচার — বিশেষত কিশোরী পাচার আজ ভয়াবহ আকার নিয়েছে। এর কারণ হিসাবে বলা হয়েছে — পুলিশী নিষ্ক্রিয়তা, চরম দারিদ্র্য, বাল্যবিবাহের উচ্চহার এবং শিক্ষায় নারীদের পশ্চাদপদতা।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্টেট এইডস্ প্রিভেনশন এ্যান্ড কন্ট্রোল সোসাইটির রিপোর্টে ঐ কাগজেই একই দিনে জানানো হয়, এইডস্-এর মারণ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৫০০০ — শুধু কলকাতাতেই। ন্যাশনাল এইডস্ কনট্রোল অর্গানাইজেশন-এর প্রজেক্ট ডিরেক্টর জানিয়েছেন, ভারতবর্ষে এখন ৩৮ লক্ষ ৬০ হাজার মানুষ এইডস্-এ আক্রান্ত। বিভিন্ন রাজ্যের ৪৫টি জেলাকে এ বাবদ স্পর্শকাতর জেলা বলা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গও এ বিষয়ে তালিকাভুক্ত হয়েছে ইতিমধ্যেই। আর এই বিপুল মৃত্যুপথযাত্রীদের ৩০ শতাংশ হল মহিলা। এই মায়েরা এইডস্ আক্রান্ত শিশুদের জন্ম দিয়ে চলেছে। সারা দেশ এগিয়ে চলেছে বলা হলেও, অন্নবস্ত্রের জন্য দেহব্যবসায়ে নিযুক্ত মা-বোনেদের সংখ্যা আজ ১ কোটির কাছাকাছি! ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এ্যাপ্লায়েড ইকনমিক রিসার্চ-এর প্রধান আবু সালে শরিফের একটি সাক্ষাৎকার টাইমস্ অফ ইন্ডিয়ায় (৭ জানুয়ারি ২০০৪) প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, ''আমাদের দেশের জনগণের ৭০ শতাংশই গরিব, এবং দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা ২৬ শতাংশের অবস্থা বারোমেসে গরিবের থেকেও খারাপ। এই সংখ্যার ৭০ শতাংশই হচ্ছে নারী! সম্প্রতি রাষ্ট্রসংঘও সমীক্ষা রিপোর্টে জানিয়েছে, বিশ্বে দারিদ্র্যের চরম সীমায় যে জনসংখ্যা আছে তার ৭০ শতাংশ হচ্ছে নারী। মিঃ শরিফ-এর বিবৃতিতে আরও জানা গেল, ''মহিলাদের ৮০ শতাংশই রক্তাল্পতায় ভোগে। মায়েরা কোনও সহায়তা ছাড়াই ৬০ শতাংশ শিশুর জন্ম দেয়। খাদ্য ও চিকিৎসা না পাওয়ার জন্যই অন্তঃসত্ত্বা নারীদের মধ্যে মৃত্যুহার এত বেশি।''

বিশ্বায়নের ফলে নারীর কর্মসংস্থানের হার বেড়েছে কিনা জানতে চাইলে তিনি জানান — না, বাড়েনি, বরং কমেছে। শুধু তাই নয়, স্থায়ী'র বদলে অস্থায়ী ক্যাজুয়াল কর্মী হিসাবে নারীর সংখ্যা বাড়ছে। চরম দারিদ্র্য, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ঘর ভেঙ্গে মা-বোনেদের করে দিয়েছে বে-ঘর, ঠেলে দিচ্ছে আদিম পেশায়। অপুষ্ট অভুক্ত জীর্ণ কিশোরী ও নারীদেহের ওপর সীমাহীন বর্বর পীড়নের যেন কোন অন্ত নেই।

একই বয়সের বয়ঃসন্ধিকালের একটি ছেলে ও মেয়ের মধ্যে মেয়ের বাড়তি পুষ্টি দরকার, অন্ততঃ ১০ শতাংশ বেশি ক্যালরি দরকার নিতান্তই শারীরবৃত্তীয় প্রাকৃতিক কারণেই। আমাদের দেশে বাড়তি দূরের কথা, প্রয়োজনীয় ক্যালরিটুকুও তাদের জোটে না। অন্তঃসত্ত্বা মায়েদের মৃত্যুর কারণ হিসাবে চিকিৎসকরা এটাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। এই রাজ্যে ৫৫ শতাংশ অন্তঃসত্ত্বা মায়েরাই রক্তাল্পতায় ভোগেন।

শুধু এই রাজ্যে অথবা শুধু ভারতবর্ষেই নয়, বিশ্বব্যাপী নারী-জীবনের উপর শোষণ-অত্যাচার-নিপীড়ন আজ বহুগুণ বেড়েছে, বাড়ছে, আরও বাড়বে। কিশোরী ও মহিলাদের উপর যৌন নিগ্রহ নিরোধক বিল (Prevention of Sexual Assault of Girls and Women Bill) নিয়ে অনেক কথাই হচ্ছে। ধর্ষণকারীর শাস্তি মৃত্যুদন্ড হওয়া উচিত কিনা তা নিয়েও জোরালো বিতর্ক হচ্ছে। কিন্তু ফাঁসি হবে কতজনের? এদেশের অবস্থাটা দেখলে মনে হয়, কল্পনার নরক বুঝি এখানে নেমে এসেছে। কেন্দ্রের নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রক বলছে — এদেশে প্রতি ঘন্টায় গড়ে একজন নারী ধর্ষিতা হচ্ছেন। আর ২০০৩ সালের অক্টোবর পর্যন্ত সারা দেশে ৫৬,০০০ ধর্ষণ মামলার পাহাড় জমে আছে। তাছাড়া এইসব অভিযুক্তদের ক্ষেত্রে কী হয়? সাক্ষ্য ও প্রমাণের অভাবে ছাড়া পেয়ে যায় এদের মধ্যে শতকরা ৭৭ জন। হবে নাই বা কেন? ''পুলিশ কিছুতেই এফ আই আর নিতে চায়না। এর সঙ্গে ডাক্তারী পরীক্ষার অব্যবস্থাও গুরুত্বপূর্ণ কারণ। এই পরিসংখ্যানের মধ্যে এটাও দেখা যাচ্ছে যে, ধর্ষিতাদের মধ্যে ৭৫ শতাংশই নাবালিকা, যাদের মধ্যে ২৫ শতাংশের বয়স ১২ বছরের কম।'' 'স্টেটসম্যান'-এর সহকারী সম্পাদকের কলমে ২৮ ডিসেম্বর '০৩ এক নিবন্ধে এই মর্মান্তিক ছবিটা ফুটে উঠেছে।

ত্রিপুরায় সি পি এম শাসিত সরকার। ২০০৩ সালে ঐ রাজ্যে নথিভুক্ত নারী নির্যাতনের সংখ্যা ৪১৮। প্রতিদিন সেখানে ১.৩৪ জন নারী নির্যাতিত হন। '৯৪ থেকে '০২ পর্যন্ত সেখানে নারী নির্যাতনের অভিযোগ লিপিবদ্ধ হয়েছে ৪৪৫৬টা। এর মধ্যে পণ সংক্রান্ত ঘটনায় ২৫৬ জন মহিলার অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার স্বীকার করেছেন যে, নারী নির্যাতনের সংখ্যা ত্রিপুরায় বাড়ছে। (আনন্দবাজার ১-১-০৪) বিভিন্ন রাজ্যের এ বাবদে হিসেব নিলে এক ভয়াবহ ছবি পাওয়া যাবে। অন্যান্য আর পাঁচটা বিষয়ের মত এ ব্যাপারেও তথাকথিত বামশাসিত রাজ্য ও অন্যান্য রাজ্যে তফাৎ কিছুই নেই।

শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে সুযোগ মেয়েদের কতটুকু? কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার একটা নির্দিষ্ট বয়সের সকল ছেলেমেয়েকেই প্রাথমিক স্তর তো বটেই — তারও পরে অন্তত অষ্টমশ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করানো বাধ্যতামূলক করার কথা ঘোষণা করেছে। সম্প্রতি 'সর্বশিক্ষা অভিযান' নিয়েও অনেক গালভরা কথা তারা বলছে। অথচ বাস্তব অবস্থাটা কি? বহু শিশু স্কুলস্তরেই শিক্ষার জগত থেকে ছিটকে পড়ছে শিক্ষাজগতের বাইরে। 'ড্রপ আউটে'র বিপুল সংখ্যার মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাই ছেলেদের তুলনায় অনেক অনেক বেশি। বহু স্কুলেই মেয়েদের জন্য কোন শৌচাগার নেই। ধর্মনিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক সার্বজনীন শিক্ষার যে দাবি বিদ্যাসাগর - রবীন্দ্রনাথ - নেতাজীরা তুলেছিলেন, স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের রাষ্ট্র ও সরকার তা অবহেলা করে পুঁজিবাদের স্বার্থেই শিক্ষা সংকোচন করে চলেছে — শিক্ষিত বেকার কমানোর উদ্দেশ্যে। আশ্চর্য, মাধ্যমিক স্তরে ব্লক পিছু একটা করে মেয়েদের স্কুল পর্যন্ত নেই। ১৯৯১ সালের সেনসাস রিপোর্টে, কোন একটা ভাষাতে লিখতে ও পড়তে জানা মানুষকেই শিক্ষিত বলা হয়েছে। তার জন্য কোন প্রথাগত শিক্ষা অথবা পরীক্ষা পাশ করার প্রয়োজন হয় না। ৪ বছরের শিশুদের বাদ দিয়ে ধরে ১৯৯১-এর সেনসাস রিপোর্ট অনুযায়ী শিক্ষিতের হার ৫২.৯১ শতাংশ। শিক্ষিত পুরুষ হচ্ছে ৬৪ শতাংশ এবং নারী মাত্র ২৯.১৯ শতাংশ। এর মধ্যে আবার তপসিলি জাতি, আদিবাসীদের মধ্যে নারীশিক্ষার হার আজও করুণ অবস্থায়। শিক্ষিত নারীদের মধ্যে তপসিলি জাতি হচ্ছে ২৩.৭৬ শতাংশ, আর আদিবাসী ১৮.১৯ শতাংশ। উনিশ শতকের মধ্যভাগে নারীশিক্ষার প্রসার ও প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন রেনেশাঁর আপোষহীন ধারার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি বিদ্যাসাগর। ১৮৫৭-৫৮ সালে তাঁর প্রচেষ্টায় কয়েকটি সরকারি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা পরবর্তীকালে যথোপযুক্ত গুরুত্ব পায়নি। ফলে সূচনাপর্ব থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত নারী শিক্ষার এই করুণ হাল। নিম্নবর্ণের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার সুযোগ আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও বাস্তবের কষ্টিপাথরে যাচাই হওয়া তথ্যে শিক্ষার অধিকার ও সুযোগ যে নামমাত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। সংবিধানের ৪৪ ধারায় বলা হয়েছে, ১০-১৪ বছর বয়সী সব শিশু (বালক ও বালিকা) বাধ্যতামূলক বিনা বেতনে শিক্ষা পাবে। ৪৬ ধারায় সমাজে দুর্বল শ্রেণীর মানুষের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বিশেষ যত্ন নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। জাতীয় শিক্ষা কমিশনের মতে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার সময় থেকে সার্বজনীন শিক্ষার সূচনা হয় এবং তা শেষ হয় অন্তত সাফল্যের সাথে অষ্টম শ্রেণী শেষ করলে।

সংবিধানের ভাল ভাল কথাগুলো সীমাবদ্ধ আছে কাগজের মধ্যেই। ১৯৭৬-৭৭ সালে তপসিলি জাতির ৬৬.৫ শতাংশ বালক-বালিকার পড়াশোনা বন্ধ হয়েছে প্রাথমিক স্তরে। আর এই স্তরে উপজাতি বালক-বালিকার পড়া বন্ধ হয়েছে

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বাধীন হাইতি'র প্রেসিডেন্টকে পদত্যাগপত্র দিতে হল মার্কিন কর্তাদের হাতে

মার্কিন দখলদারির এক নতুন অধ্যায় শুরু হল। এবার লক্ষ্যস্থল মধ্য আমেরিকার হাইতি। অতিদ্রুত আমেরিকা হাইতি দখল করে নিল। মার্কিন কামানের নিশানার মধ্যে এসে গেল ভেনেজুয়েলা।

হাইতির ২০০ বছরের ইতিহাসে জাঁ বার্ট্রান্ড আরিস্তিদে ছিলেন প্রথম নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি। তিনি ছিলেন চার্চের একজন ক্যাথলিক পুরোহিত। কিন্তু তাঁর ধর্ম তাঁকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে, স্বদেশের অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের হয়ে রুখে দাঁড়াতে প্রেরণা দিয়েছিল। তাই ভ্যাটিকানের পোপ নির্দেশিত পথ থেকে সরে এসে তিনি 'মুক্তির ধর্মের' (লিবারেশন থিওলজি) প্রবক্তা হয়ে দাঁড়ান। এজন্য তাঁর চার্চটিকে ধ্বংস করে দিয়েছিল মিলিটারি শাসকরা। আমেরিকার নিউ ইয়র্ক টাইমস্ পত্রিকার ভাষায় তিনি হচ্ছেন 'বামঘেঁষা জাতীয়তাবাদী'। ২০০৩ সালের নির্বাচনে ৬৫ শতাংশ ভোটদানের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ৯০ শতাংশ ও শহরাঞ্চলে ১০০ শতাংশ ভোট পেয়ে তিনি নির্বাচিত হন।

হাইতি একটি ক্ষুদ্র দেশ। হিসপানিওলা দ্বীপের অর্ধাংশে হাইতির অবস্থান। বাকি অর্ধাংশ হচ্ছে ডোমিনিকান রিপাবলিক। পশ্চিম গোলার্ধের দরিদ্রতম ও বিশ্বের চতুর্থ দরিদ্রতম দেশ হচ্ছে হাইতি। পুঁজিবাদী শোষণের নিয়মেই সে দেশের ৭৫ শতাংশ মানুষ দৈনিক ১ ডলারেরও কম আয়ের উপর কোনক্রমে বেঁচে থাকে, অন্যদিকে দেশের মোট সম্পদের অর্ধেকই কুক্ষিগত করেছে মাত্র ১ শতাংশ মানুষ। নিরন্ন বুভুক্ষু সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভোটেই আরিস্তিদে জয়ী হয়েছিলেন। তাঁর বিরোধীদের কবজায় বিপুল অর্থ ও অস্ত্র ছিল ঠিকই, কিন্তু জনগণের মধ্যে তাদের কোন স্থান ছিল না। ২০০০ সালের নির্বাচনের সময়ে নেওয়া একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল হাইতির মাত্র ৮ শতাংশ মানুষ বিরোধীদের সমর্থন করে। এই অবস্থায় প্রেসিডেন্ট আরিস্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা আমেরিকার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে যে, তিনি স্বৈরাচারী শাসন চালাচ্ছেন, গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র তৈরি করাচ্ছেন, কিংবা সন্ত্রাসবাদে মদত দিচ্ছেন, আল কায়েদার সাথে বা মুসলিম মৌলবাদীদের সাথে তাঁর যোগাযোগ আছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু অভিযোগের অভাব মার্কিন শাসকদের বাধা দিতে পারেনি। আমেরিকার সরকারে যখন যে দলই থাকুক, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ সর্বদাই হাইতিকে আমেরিকার মুঠোয় রাখতে চেয়েছে। আরিস্তিদে যখন জনগণের বিপুল ভোটে পুনরায় প্রেসিডেন্ট পদে জয়ী হচ্ছেন, ঠিক তখনই আমেরিকায় সুপ্রিম কোর্টের একটি সন্দেহজনক রায়ের সুবাদে প্রেসিডেন্ট পদে বসেছেন জর্জ বুশ। ১৯৯৪ সালে আরিস্তিদে যখন পুনরায় ক্ষমতা ফিরে পান, তখন হাইতির পুরনো মিলিটারি ও পুলিশ অফিসার, ভাড়াটে খুনী ও ক্রিমিনাল গ্যাংগুলো হাইতি ছেড়ে পালিয়ে যায়। এরা আবার জড়ো হয়েছিল প্রতিবেশী দেশ ডোমিনিকান রিপাবলিকে ও লাগোয়া মার্কিন প্রদেশ মিয়ামিতে। অবশ্যই আমেরিকার মদত ছিল এদের পিছনে। অনেকেরই হয়তো স্মরণে আছে নিকারাগুয়ার সান্দিনিস্তা সরকারের বিরুদ্ধে হানাদারি চালাবার জন্য এল সালভাদোরের মাটিতে ট্রেনিং দিয়ে কন্ট্রা নামে একটি খুনী সশস্ত্র ভাড়াটে বাহিনী আমেরিকা তৈরি করেছিল। হাইতির পলাতক খুনেদের জড়ো করে ঠিক তেমনই একটি হানাদার বাহিনী তৈরি করা হয়েছিল। আধুনিক মার্কিন অস্ত্রে সজ্জিত এই সন্ত্রাসী বাহিনীই গত ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে হাইতিতে ঢুকে পড়ে। পশ্চিমী সংবাদমাধ্যম তৎক্ষণাৎ এদেরকে 'বিদ্রোহী' বলে বর্ণনা করতে শুরু করে দেয়, যেন হাইতির অভ্যন্তরে সত্যই কোন 'বিদ্রোহ' বা 'গণঅভ্যুত্থান' ঘটে গেছে। ইতিমধ্যে সি এন এন, বি বি সি ও নিউ ইয়র্ক টাইমস্-এর মতো সংবাদমাধ্যম ব্যস্ত হয়ে পড়ল হাইতি সম্পর্কে একটা ভয়াবহ ছবি প্রচার করতে। তারা দেখাতে শুরু করল যে, হাইতির ভিতরকার অবস্থা খুবই খারাপ, আরিস্তিদে হচ্ছেন একজন মানসিক বিকারগ্রস্ত প্রেসিডেন্ট, যিনি নিজেকে 'বিরাট ক্ষমতাবান' বলে ভাবতে ভালবাসেন। তাঁর কুশাসনে ক্ষুব্ধ হাইতির জনগণ এবার বিদ্রোহ করেছে, অসভ্য কালো মানুষরা নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি করছে। সংবাদপত্রে এ প্রশ্ন একবারও তোলা হল না যে, এই 'বিদ্রোহীরা' কারা?

৫ মার্চ রাজধানী পোর্ট অফ প্রিন্সের রাস্তায় মার্কিন সেনাদের ধিক্কার জানাচ্ছে হাইতির জনগণ

কোত্থেকে এরা এল? কে এদের নেতৃত্ব দিচ্ছে?

এই সন্ত্রাসী বাহিনী যখন পাশের দেশ থেকে ঢুকে হাইতিতে শহরের পর শহরে সন্ত্রাস ও লুট চালাতে শুরু করল, তৎক্ষণাৎ আমেরিকা হাইতির সমুদ্র উপকূলে ২০০০ মার্কিন সেনাসহ জাহাজ নোঙর করাল এবং নিরাপত্তা দেওয়ার অজুহাতে নতুন একদল সেনা পাঠাল। একদা হাইতি সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্সের উপনিবেশ ছিল। সেই সুবাদে ফ্রান্সও 'নিরাপত্তা' দেওয়ার নামে সেনা পাঠাল। হাইতির সস্তা শ্রম লুঠের কারবারে কানাডার ভাগীদারি আছে। অতএব কানাডাও, আমেরিকার ঘনিষ্ঠ মিত্র বলে নিজের পরিচয় দিয়ে দ্রুত সেনা নিয়ে জর্জ বুশের সাহায্যে এগিয়ে গেল। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের তৎপরতাও লক্ষ্য করার মতো। ইরাকে মার্কিন দখলদারিকে ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রসংঘ অনুমোদন দিয়েছে, এবার হাইতির জন্য একটি আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বাহিনী গড়তে অতি দ্রুত সম্মতি দিল রাষ্ট্রসংঘ। সমস্ত কর্মকাণ্ড মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যেই সারা হয়ে গেল।

এই নিরাপত্তা কার জন্য? সি আই এ এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী এজেন্সিগুলির কাছে খুবই পরিচিত খুনী ও ড্রাগ ব্যবসায়ীদের সন্ত্রাসী বাহিনী যেখানে গণতান্ত্রিক উপায়ে জনগণের বিপুল ভোটে নির্বাচিত একজন প্রেসিডেন্টকে 'অবরুদ্ধ' করে রেখেছে, সেক্ষেত্রে যে কেউ ভেবে নেবে যে, নিরাপত্তার কথা বলা হচ্ছে প্রেসিডেন্টের জন্যই। কিন্তু, বাস্তবে ঘটল ঠিক তার বিপরীত।

মার্কিন অর্থ ও অস্ত্রে বলীয়ান সন্ত্রাসী খুনী বাহিনীর সামনে একটি দেশের প্রেসিডেন্ট অসহায় হয়ে পড়লেন, তার কারণ, হাইতির আত্মরক্ষার জন্য নিজস্ব কোন সেনাবাহিনী ছিল না। স্বৈরাচারী খুনী শাসক ডুভালিয়ার ও তার ছেলে পাপা ডক-এর চরম অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ লড়াই করেই আরিস্তিদে হাইতির জনগণের নেতায় পরিণত হন। ১৯৯০ সালে প্রথম নির্বাচিত হওয়ার পর যেইমাত্র তিনি গরিবদের জন্য প্রতিশ্রুত কিছু কার্যক্রম রূপায়িত করতে শুরু করেন, তৎক্ষণাৎ ডুভালিয়ারের অনুগত মিলিটারি অফিসাররা ষড়যন্ত্র শুরু করে এবং সি আই এ-র মদতে ৭ মাসের মধ্যে ক্যু করে আরিস্তিদেকে ক্ষমতাচ্যুত করে দেয়। আবার শুরু হয় অত্যাচারী মিলিটারি শাসন। হাইতি থেকে উদ্বাস্তুর স্রোত আমেরিকার দিকে ধাবিত হয়। আমেরিকার উপর আন্তর্জাতিক চাপও বৃদ্ধি পায়। তদানীন্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টনের নির্দেশে হাইতিতে মার্কিন সেনা যায়, মিলিটারি শাসকদের হটিয়ে আবার আরিস্তিদেকে প্রেসিডেন্ট পদ ফিরিয়ে দিতে আমেরিকা বাধ্য হয়। কিন্তু আরিস্তিদেকে চাপে রাখতেই আমেরিকা হাইতির গুণ্ডাবাহিনী, ড্রাগ ব্যবসায়ীদের সন্ত্রাসী স্কোয়াড ও সামরিক উর্দিপরা খুনী বাহিনীকে নিরস্ত্র করার কোন চেষ্টাই করেনি।

১৯৯৪ সালে ক্ষমতায় ফিরেই আরিস্তিদে সরাসরি সেনাবাহিনী ভেঙে দেন, সেনাদের সাথে যোগাযোগ ছিল এমন পুলিশ অফিসারদের বরখাস্ত করেন। এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে একটি নতুন পুলিশ বাহিনী গঠন করেন। আরিস্তিদের উদ্দেশ্য ছিল যেমন মিলিটারি ষড়যন্ত্রকে ঠেকানো, আবার ধর্মবিশ্বাস থেকে তিনি গভীরভাবে মনে করতেন যে, অহিংসার শান্তিপূর্ণ পথেই তিনি নতুন হাইতি গড়ে তুলতে পারবেন। এখন যারা হাইতির ভিতরে ঘোর অরাজক অবস্থা তৈরি করেছে, তারা হচ্ছে পুরনো সেই বিক্ষুব্ধ সেনা ও পুলিশ অফিসারদের গোষ্ঠী ও ড্রাগ ব্যবসায়ীদের ভাড়াটে খুনীর দল। এদেরকেই সাম্রাজ্যবাদী সংবাদমাধ্যম এখন ''বিদ্রোহী'' সাজিয়ে প্রচার দিচ্ছে। মার্কিন আধুনিক অস্ত্রে বলীয়ান এই খুনী বাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো শক্তি আরিস্তিদের তৈরি করা পিস্তল-সম্বল পুলিশ বাহিনীর আদপেই নেই। মার্কিন মদতপুষ্ট এই খুনে বাহিনীকে দিয়েই হাইতির অভ্যন্তরে ''বিদ্রোহের'' ঢেউ তুলে দেওয়া হল, যাতে দেশের সামাজিক কাঠামোটিই ভেঙে পড়ে এবং সেটাকেই দেখিয়ে ধুয়া তোলা যায় যে, এখনই বাইরের হস্তক্ষেপ না ঘটলে হাইতিতে 'রক্তগঙ্গা' বয়ে যাবে, ফলে মানুষের জীবন বাঁচানোর প্রয়োজনেই হস্তক্ষেপ করা দরকার। এই প্রচার তোলার জন্য 'মানবাধিকার' নামের একটা বিশেষ শিল্প সাম্রাজ্যবাদীদের টাকায় গড়ে তোলা হয়েছে, যাদের বেতনভুক কর্মচারীও আছে, যারা ''মানবাধিকার গেল গেল'' রব তুলে বিশ্বের মানুষকে বিভ্রান্ত করে এবং তার সুযোগে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা কোন স্বাধীন দেশে হস্তক্ষেপ করে তার দখল নেয়। হাইতির ক্ষেত্রে সেটাই ঘটল। এজন্যই প্রচারমাধ্যমে দেখানো হয়েছে যেন আরিস্তিদে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গজদন্তমিনারে বাস করেন, জনগণের সাথে তাঁর যোগাযোগ নেই। ''বিরোধীদের'' ছোট খাটো সভার প্রচার দেওয়া হয়েছে বিরাট আকারে। আরিস্তিদের সমর্থনে হাজার হাজার মানুষের মিছিল ও সভাগুলিকে প্রচার দেওয়া হয়নি। সশস্ত্র খুনে বাহিনীর বিরুদ্ধে নিরস্ত্র জনগণের ব্যারিকেড লড়াইয়ের খবর প্রচার পায়নি, আরিস্তিদেকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করার পর হাইতি জুড়ে যে বিশাল গণবিক্ষোভ চলছে, তা বাইরের মানুষকে জানতে দেওয়া হয়নি। সবটাই করা হয়েছে একথা বোঝাতে যেন হাইতির জনগণের স্বার্থেই সাম্রাজ্যবাদীরা সেখানে হস্তক্ষেপ করেছে।

আমেরিকা, ফ্রান্স ও কানাডার সেনাবাহিনী হাইতি পৌঁছে যাওয়ার পর সন্ত্রাসী বাহিনী একটার পর একটা শহর, গ্রাম দখল করে রাজধানীর মুখে এসে পড়ে। এ অবস্থায় আরিস্তিদে হাইতির মার্কিন দূতাবাসে অনুরোধ জানালেন, যাতে প্রেসিডেন্টের আবাসস্থল ঘিরে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। মার্কিন দূতাবাস সেই অনুরোধ অগ্রাহ্য করল। শুধু তাই নয়, প্রেসিডেন্টকে নিজস্ব নিরাপত্তারক্ষীর সংখ্যা বাড়াতে নিষেধ করল। এবং ওয়াশিংটন, প্যারিস ও ওটাওয়া থেকে এই বলে শোরগোল তোলা হল যে, হাইতির 'নিরাপত্তার' জন্য নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে 'চলে যেতে' হবে। ২৮ ফেব্রুয়ারি সেটাই ঘটল।

২৮ ফেব্রুয়ারি রাতে ঠিক কী ঘটেছিল? মার্কিন শাসকদের ভাষ্য অনুযায়ী, হাইতিতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেমস্ ফোলে'র কাছে প্রেসিডেন্ট নিরাপত্তার জন্য সামরিক সহায়তা চাইলে, মিঃ ফোলে প্রেসিডেন্টকে একথা বোঝাতে সমর্থ হন যে, বিদ্রোহীরা অল্প সময়ের মধ্যেই রাজধানীতে ঢুকে পড়বে। এখনই যদি আরিস্তিদে পদত্যাগ না করেন, তাহলে ব্যাপক রক্তপাত হবে, হাজার হাজার মানুষের প্রাণ যাবে। একথা শুনেই আরিস্তিদে নাকি দেশত্যাগ করতে রাজি হয়ে যান। তখন মার্কিন দূতাবাসের অসামরিক কর্মীরা পরিবার সহ তাঁকে বিমানবন্দরে নিয়ে যায় এবং সেখানেই তিনি মার্কিন কর্মচারীদের হাতে পদত্যাগপত্র জমা দেন। তিনি নাকি দক্ষিণ আফ্রিকায় যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার তাঁকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করায়, আমেরিকা তাঁকে সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকে পাঠিয়ে দেয়। সমস্ত ঘটনার মিথ্যাচার ও ষড়যন্ত্র অত্যন্ত প্রকট। প্রথমত, দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার জানিয়েছে, আরিস্তিদের কাছ থেকে আশ্রয়ের কোন অনুরোধই তারা পায়নি, ফলে তা অস্বীকার করার প্রশ্ন ওঠেনা, বরং আরিস্তিদে জানিয়েছেন যে,

পাঁচের পাতায় দেখুন

ইরাক জুড়ে গেরিলা হানা

৩ মার্চ ঃ বাগদাদ শহরের এক ঘনবসতি অঞ্চলে গেরিলাদের ছোঁড়া তিনটি ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে টহলরত তিন মার্কিন সেনা গুরুতর আহত হয়েছে। বাগদাদের পশ্চিমে হালাবজা শহরে আত্মঘাতী গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে মার্কিন দালাল ইরাকি পুলিশ বাহিনীর চারজন নিহত হয়েছে। (এ পি, ৪-৩-০৪)

৪ মার্চ ঃ মোসুল শহরে একটি থানায় ইরাকি গেরিলা যোদ্ধারা রকেট ও দেশি বোমা নিয়ে আক্রমণ চালালে মার্কিন দালাল ইরাকি পুলিশবাহিনীর তিনজন নিহত হয়। (আনন্দবাজার ৫-৩-০৪)

৫ মার্চ ঃ বাগদাদের দক্ষিণ-পূর্বে এক বোমা বিস্ফোরণে টহলরত তিনজন উজবেক সেনা নিহত এবং একজন গুরুতর আহত হয়েছে।

অপর একটি ঘটনায় রাস্তার ধারে পেতে রাখা দেশি বোমার সঙ্গে একটি মার্কিন সেনা জীপের ধাক্কায় প্রচণ্ড বিস্ফোরণে মার্কিন প্রথম আর্মার্ড ডিভিশনের তিন সেনা ঘটনাস্থলে নিহত হয়েছে।

আর একটি ঘটনায় একটি দেশি বোমা বিস্ফোরণে মার্কিন চতুর্থ পদাতিক ডিভিশনের তিন সেনা গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। (ডেকান হেরাল্ড, ৬-০৩-০৪)

৬ মার্চ ঃ মধ্য বাগদাদে চলন্ত এক মার্কিন সেনা কনভয়ের উপর গেরিলারা আক্রমণ চালালে দু'জন মার্কিন সেনা নিহত এবং ডজন খানেক সেনা গুরুতর আহত হয়েছে।

উত্তর ইরাকের তিকরিত শহরেও মার্কিন সেনা কনভয়ের উপর আক্রমণ হয়েছে, তবে হতাহতের খবর জানা যায়নি। (ডেকান হেরাল্ড ৭-৩-০৪)

৭ মার্চ ঃ বাগদাদের পশ্চিমে হাইইয়াতে একটি বিস্ফোরক ভর্তি ট্রাক লক্ষ্য করে টহলরত মার্কিন সেনারা গুলি চালায়। ট্রাকটি বেসামাল হয়ে নিকটবর্তী মার্কিন নজরদারি ঘাঁটিতে সজোরে ধাক্কা মারলে ঘাঁটিতে আগুন ধরে যায়। এর ফলে আগুনে পুড়ে দু'জন মার্কিন সেনা মারা গেছে ও চারজনের সারা শরীর ঝলসে গেছে। (রয়টার্স, এপি ৮-৩-০৪)

১০ মার্চ ঃ বালাদ শহরে সেনা কনভয়ের ওপর গেরিলাদের আক্রমণে মার্কিন সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের ২ জন সেনা নিহত ও অপর ৪ সেনা গুরুতরভাবে আহত হয়েছে।

১১ মার্চ ঃ বাকুবা শহরে একটি আত্মঘাতী গাড়িবোমা বিস্ফোরণে ১ জন মার্কিন সেনা নিহত ও অপর ২ জন আহত হয়েছে। (এশিয়ান এজ, ১২-৩-০৪)

১৩ মার্চ ঃ মার্কিন মদতপুষ্ট ইরাকি গভর্নিং কাউন্সিলের জনৈক প্রভাবশালী মন্ত্রীর বাড়িতে গেরিলাদের ছোঁড়া বোমা বিস্ফোরণে ৭ জন মারা গেছে। (ঐ, ১৪-৩-০৪)

মধ্য বাগদাদে রাস্তার ধারে পেতে রাখা বোমা বিস্ফোরণে দু'জন মার্কিন সেনা নিহত ও পাঁচজন সেনা গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। উত্তর ইরাকের তিকরিত শহরে আরো একটি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় আরও দু'জন মার্কিন সেনা নিহত হয়েছে। (দি টেলিগ্রাফ ১৪-৩-০৪)

১৪ মার্চ ঃ বাগদাদে বোমা ও গ্রেনেড বিস্ফোরণে চারজন মার্কিন সেনা মারা গেছে। গতকালের মতো আজও তিকরিত শহরে গ্রেনেড আক্রমণে ১ জন মার্কিন সেনা নিহত ও ৫ সেনা গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। (হিন্দু, ১৫-৩-০৪)

১৫ মার্চ ঃ উত্তর ইরাকের মোসুল শহরে গেরিলাদের আক্রমণে একটি মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানির ৫ জন মার্কিন কর্মচারী নিহত হয়েছে। মোসুলে ইরাকি গেরিলারা ইরাকি তেলমন্ত্রকের ভবন সহ একটি পাইপলাইনের উপর আঘাত হেনেছে, হতাহতের খবর মেলেনি। কিরকুক শহরে গেরিলারা মার্কিন দালাল তুর্কমেন ফ্রন্ট-এর সহ সভাপতিকে হত্যা করেছে।

১৬ মার্চ ঃ বাগদাদ শহরে এক আত্মঘাতী গাড়িবোমা বিস্ফোরণে রাস্তায় টহলরত তিন উজবেক ও দুজন পোলিশ সেনা মারা গেছে। (ডেকান হেরাল্ড ১৭-৩-০৪)

১৭ মার্চ ঃ কারাদা জেলার মাউন্ট লেবানন হোটেলে এক আত্মঘাতী গাড়িবোমা বিস্ফোরণে ২৭ জন প্রাণ হারিয়েছে। নিহতদের মধ্যে জনাকয়েক আমেরিকান ও ব্রিটিশ সেনাকর্মীও রয়েছে। (হিন্দুস্থান টাইমস, ১৮-৩-০৪)

১৮ মার্চ ঃ ইরাকের তিন জায়গায় গেরিলা আক্রমণে কমপক্ষে ৯ জন মারা গেছে। ফালুজা শহরে গেরিলারা গুলি করে একটি মার্কিন সেনা হেলিকপ্টারকে মাটিতে নামিয়ে এনেছে। এটা নিয়ে এ বছরই ৪টি মার্কিন হেলিকপ্টারকে গেরিলারা গুলি করে নামাল। পশ্চিম ইরাকে সিরিয়া সীমান্তের লাগোয়া কুসাইবায় গেরিলাদের মর্টার আক্রমণে একজন মার্কিন মেরিন-সেনা নিহত হয়েছে। ফালুজা শহরে গেরিলারা আবারও রকেট চালিত গ্রেনেড নিয়ে টহলরত মার্কিন সেনাদের উপর হামলা চালিয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি। বন্দর শহর বসরায় মিরবাদ হোটেলে এক গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে চার ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছে এবং এই চার ব্যক্তিই ইরাকস্থিত মার্কিন প্রশাসনিক দপ্তরের কর্মী। বাগদাদের উত্তর-পূর্বে বাকুবা শহরে ইরাকি দূরদর্শন কেন্দ্রের সামনে বোমা বিস্ফোরণে তিনজন নিহত এবং দশজন আহত হয়েছে। হতাহত সব ব্যক্তিই মার্কিন দালাল ইরাকি পুলিশ বাহিনী এবং দূরদর্শনের কর্মী। (হিন্দু ১৮-৩-০৪)

২০ মার্চ ঃ ফালুজা শহরে গেরিলাদের রকেট হানায় ২ জন মার্কিন সেনা নিহত ও ৭ জন আহত হয়। বাগদাদে মার্কিন অসামরিক সদর দপ্তরের উপর অন্তত তিনটি রকেট ছুঁড়েছে গেরিলারা। বিস্ফোরণে এক ইরাকি নাগরিক নিহত ও ২ জন আহত হয়। বাগদাদের উত্তরে এক থানার উপর গেরিলাবাহিনীর বোমা বিস্ফোরণে ১ পুলিশকর্মী নিহত ও ২ জন আহত হয়। (দি হিন্দু ২১.৩)

স্বাস্থ্যব্যবস্থার বেসরকারীকরণের প্রতিবাদে

বেলজিয়ামে আন্দোলন

১ জানুয়ারি ২০০৪, বেলজিয়ামের বন্দর শহর অ্যান্টওয়ার্পের আটটি সরকারি হাসপাতালকে তুলে দেওয়া হল ব্যবসায়ীদের হাতে। প্রাথমিকভাবে ছাঁটাই হল ৮০০ জন কর্মচারী। নববর্ষের প্রথম দিনে এমন উপহারে শহরের সাড়ে চার লক্ষেরও বেশি অধিবাসী রীতিমত ক্ষুব্ধ।

বন্দর শহরের পৌর কর্তৃপক্ষ অবশ্য নিজেদের কাজের সাফাই গেয়েছেন — এর দ্বারা নাকি হাসপাতালের সামাজিক গুরুত্বকে অস্বীকার করা হচ্ছে না। অথচ কর্মচ্যুতির পাশাপাশি জনগণের ট্যাক্সের টাকায় গড়ে ওঠা হাসপাতালগুলিকে পরিকাঠামো সহ তুলে দেওয়া হচ্ছে কারবারীদের হাতে। অতঃপর অসুস্থ মানুষজনকে আর রোগী হিসেবে নয়, আসতে হচ্ছে 'চিকিৎসা ক্রেতা' হয়ে, যেখানে একজন পেসমেকারগ্রহীতা হৃদ্‌রোগী কিংবা হাঁটুর কৃত্রিম মালাইচাকির ক্রেতাই তাদের কাছে বেশি লাভজনক এবং আকর্ষণীয় হবে, একটি নিউমোনিয়া আক্রান্ত শিশু নয়।

কিন্তু হাসপাতালগুলির ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী ও শ্রমিক-কর্মচারীদের মতে, বেসরকারীকরণ ও জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষা কিছুতেই একসাথে হতে পারে না। তাই গড়ে উঠেছে 'অ্যান্টওয়ার্প সরকারি হাসপাতাল বাঁচাও কমিটি'। তাতে সামিল হয়েছে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান, ট্রেড ইউনিয়ন ও দারিদ্র্য প্রতিরোধের আন্দোলনে সংগ্রামরত সংগঠনগুলিও। তারা বলেছে, স্বাস্থ্যের সুরক্ষা জনগণের মৌলিক অধিকার। তারা দাবি করেছে, এ বিষয়ে পৌরসভাকে জনমত নিতে হবে। শুধু দাবি করেই তারা ক্ষান্ত থাকেনি, নিজেরাই নেমে পড়েছে জনমত সংগ্রহে।

আন্দোলনের সংগঠক মিই ব্রঁদা জানিয়েছেন, গত ২৯ ডিসেম্বর কমিটির প্রতিনিধিরা কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি জমা দিতে গেলে পুনর্বিবেচনার ভান করে তা নিতে অস্বীকার করা হয়। আর তারপরই ৩১ ডিসেম্বর হাসপাতালগুলির হস্তান্তরের ঘোষণা হয়ে যায়।

এরপর চিকিৎসা পাওয়ার জন্য নির্ধারিত দাম দিতে না পারায় রোগীকে ফিরিয়ে দেওয়ার খবর ক্রমাগত আসতে থাকে। এ পরিস্থিতির জন্যও সংগঠকরা সজাগ ছিলেন। তাই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি তাঁরা স্থাপন করেছেন কয়েকটি অস্থায়ী চিকিৎসাকেন্দ্র। সেখানেও বাড়তে থাকে রোগীর সংখ্যা। তাঁদের আন্দোলন-লড়াই তো রোগীর বিরুদ্ধে নয়, স্বাস্থ্য পরিষেবাকে বাজারের পণ্য বানানোর চক্রান্তের বিরুদ্ধে। ডাক্তার-নার্স-কর্মচারীদের রুটি-রুজির লড়াইয়ে সাথে তাই মিশে গেছে জনস্বাস্থ্য আন্দোলন। তাই ডাক্তারের হাতের প্রতিবাদপত্রের কপি চেয়ে নিয়ে তাতে স্বাক্ষর করে যায় বন্দর শহরের শ্রমিক-কর্মচারীরা।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবু উল্লসিত হতে পারেন এটা দেখে যে, তাঁদের মদতদাতা ব্যবসায়ীদের মাসতুতো ভায়েরা অ্যান্টওয়ার্পেও আছে, আর সেখানকার মতো গণসম্পদ বেচে দেওয়ার জন্য বুদ্ধবাবুরাও অটল। এই 'শুভকাজে' কোন বাধাই তাঁরা মানতে রাজী নন। তাই জনগণের বিরুদ্ধে তাঁদের রণহুঙ্কার ঃ 'হাসপাতালে আন্দোলন চলবে না', 'অশান্তি বরদাস্ত করব না'।

কিন্তু শ্মশানের শান্তি, বাঁচতে আগ্রহী মানুষের কাম্য নয়। তাই আন্দোলনের বিশ্বায়ন, লড়াইয়ের বিশ্বায়ন দেশ রাষ্ট্রের বেড়া ভেঙে জনগণকেও সমস্বার্থের ময়দানে মিলিয়ে দিচ্ছে। মুমূর্ষু পুঁজিবাদ ধার করা আয়ু নিয়ে বাঁচার ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছে। আর, দেশে দেশে বিপুল জনশক্তি ফুঁসে উঠছে জনস্বাস্থ্য রক্ষার আন্দোলনে।

(সংবাদ সূত্র ঃ সলিডেয়ার, ১৪-১-০৪ এবং ৪-২-০৪)

হাইতি

চারের পাতার পর

দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের কাছ থেকে অস্ত্র সাহায্য এসে পৌঁছবার কথা ছিল ২৯ ফেব্রুয়ারি এবং ভেনেজুয়েলা সরকারের সেনা পাঠানো নিয়ে আলোচনা চলছিল। দ্বিতীয়ত, মার্কিন বিবৃতি থেকে পরিষ্কার যে, আমেরিকাই চাপ দিয়ে আরিস্তিদেকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছে। কারণ, কোন পর্যায়েই আরিস্তিদে সরকারের প্রধানমন্ত্রীকে আলোচনায় যুক্ত করা হয়নি, শুধু তাই নয়, আরিস্তিদে তাঁর পদত্যাগপত্র হাইতির সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষের যথা, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে পেশ না করে সরাসরি মার্কিন দূতাবাসে জমা দিয়েছেন। অথচ, হাইতির সংবিধান অনুযায়ী হঠাৎ প্রেসিডেন্টের মৃত্যু হলে বা কোন কারণে পদত্যাগ করলে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিই হবেন প্রেসিডেন্ট। ঘটনা হল, মার্কিনীরা যখন অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসাবে প্রধান বিচারপতিকে দিয়ে শপথ নেওয়াল, ততক্ষণে আরিস্তিদেকে তারা বিমানে তুলে দিয়েছে এবং ঐ শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানেও দেশের প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। আমেরিকার নিজস্ব বক্তব্য থেকেই ধরা পড়ে, প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে যে ক্যুপ করা হল, সেটা হাইতির কোন শক্তির দ্বারা হয়নি, খোদ মার্কিন দূতাবাসই সেটা করেছে।

আরিস্তিদের বিবৃতিতেও একথারই স্বীকৃতি মিলেছে। মোবাইল ফোনে আমেরিকায় কয়েকজন বন্ধুর সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে তিনি পরবর্তীকালে এক বিবৃতিতে বলেছেন, ২৮ ফেব্রুয়ারি রাতের অন্ধকারে 'সাদা চামড়ার' সামরিক কর্মচারীরা আমার বাড়িতে এসে ভয় দেখিয়ে বলে যে, সশস্ত্র সন্ত্রাসী বাহিনী হাইতির রাজধানীর দখল নিয়েছে, আমি পদত্যাগ না করলে তারা হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করবে। এই বক্তব্য ছিল মিথ্যার চেয়ে ভয়ানক। আসলে সাদা চামড়ার সশস্ত্র সামরিক বাহিনীই ততক্ষণে জাতীয় প্রাসাদ ঘিরে ফেলেছিল, রাজধানীর বিমান বন্দর তখন তাদের দখলে, বাস্তবে হাইতি ততক্ষণে বিদেশিদের বেআইনি দখলে চলে গিয়েছিল। বিপুল রক্তপাতের হুমকি দিয়ে সামরিক কর্তারা আমার কাছ থেকে পদত্যাগ পত্র আদায় করে নেয়, জোর করে বিমান বন্দরে নিয়ে গিয়ে প্লেনে তুলে দেয়। তাঁকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কোথায় তাঁকে রাখা হবে, তার কিছুই তাঁকে জানানো হয়নি।

২৮ ফেব্রুয়ারি রাতের অন্ধকারে আমেরিকা কাজটি সেরেছে, তার কারণ, আরিস্তিদেকে তারা দুনিয়ার চোখে 'দানব' বানাতে পারেনি, 'স্বৈরাচারী', 'সন্ত্রাসবাদে মদতদার' ইত্যাদি অভিযোগ তুলতে পারেনি, আফ্রিকার অন্যান্য রাষ্ট্রনায়কদের দিয়ে তাঁর মুখও বন্ধ করাতে পারেনি। ফলে, এক্ষেত্রে সত্যটা নগ্নভাবে বেরিয়ে এসেছে যে, কোনও দুর্বল দেশের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত কোনও শাসক বা সরকার ক্ষমতায় থাকতে পারবেন কি পারবেন না, জনগণের ইচ্ছানুযায়ী শাসন চালাতে পারবেন কি পারবেন না, তা স্থির করার একমাত্র মালিক হচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার সহযোগীরা। আমেরিকার দাবিও আজ সেটাই। কিন্তু কোনও আন্তর্জাতিক আইনে ও অধিকারের নৈতিক ব্যাখ্যায় এই দাবির সমর্থন পাওয়া যাবে না।

(তথ্যসূত্র : ফ্রন্টলাইন পত্রিকা)

নারী নির্যাতন

তিনের পাতার পর

৭৯.৮ শতাংশ। বলাবাহুল্য এদের মধ্যে বালিকাই বেশি। অষ্টম পরিকল্পনার ('৯২-'৯৭) মাঝামাঝি, '৯৪-'৯৫ সালে বিদ্যালয়ে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপাতের হিসেব অনুযায়ী প্রাথমিক স্তরে প্রতি ১১৪.৫ জন ছাত্র প্রতি ৯২.৬ জন ছাত্রী। ঐ বছরে মাধ্যমিক স্তরে প্রতি ৭৯ জন ছাত্র প্রতি ৫৫ জন ছাত্রী, উচ্চ মাধ্যমিকে প্রতি ৪১.৫ জন ছাত্র প্রতি ২৩.৩ জন ছাত্রী। অষ্টম পরিকল্পনার শেষে ('৯৪-'৯৬) মাধ্যমিক স্তরে তালিকাভুক্ত ছাত্রী ৩৯ শতাংশ এবং উচ্চ মাধ্যমিকে ৩৫.৩ শতাংশ। ৪৩.২ শতাংশ ছাত্রীর নাম ছিল প্রাথমিক স্তরের খাতায়। আসলে ৬১ শতাংশ নারীই এখনো ন্যূনতম শিক্ষার আলোক পায়নি। তপসিলি ও উপজাতিদের ৭৬.২৪ শতাংশ ও ৮১.৮০ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষার আলো পায়নি। বিপুল অন্ধকারে ভারতবর্ষের নারীসমাজ।

শিশুশ্রমিকের রেকর্ড সংখ্যার অধিকারী এই দেশে কৃষক, ক্ষেতমজুর, প্রান্তিক চাষী, বিড়ি শ্রমিক ও সাধারণ মজুরদের ঘরের ছেলেমেয়েদের কাছে পড়াশোনা হচ্ছে বিলাসিতা। পেটের জ্বালায় তাদের রোজগার না করে উপায় কী? আর রোজগারের সঙ্গে বালিকাদের ঘর-গৃহস্থালীর অনেক কাজও করতে হয়। ঘরের কাজগুলোর ৯২ শতাংশ করে নারী। সকলের খাদ্যসামগ্রী জুগিয়ে ঘরের মায়েরা পায় ৬ শতাংশ খাবার। একেই লেনিন বলেছিলেন, ঘরে ঘরে বিপুল শ্রমশক্তির বর্বর অনুৎপাদক অপচয়। তপসিলি জাতি-উপজাতি কমিশনারের রিপোর্ট এটা স্বীকার করেই বলছে, তপসিলিভুক্ত জাতি-উপজাতি এবং দেশের বাকি জনসমষ্টি — এই দু'য়ের মধ্যে শিক্ষাগত পার্থক্য বিরাট। এদের মধ্যে যারা দারিদ্র্যসীমার নিচে, যারা খেতমজুর, বনজসম্পদ কুড়ানি, প্রান্তিক চাষী এবং ছোটখাট কারিগর — তাদের মধ্যে অশিক্ষার সমস্যা প্রবল।

ঐ রিপোর্টেই এর সঙ্গে যুক্ত করে বলা হয়েছে, এইসব এলাকায় শিক্ষার সুযোগের অভাবই এর কারণ। স্কুলের স্বল্পতা বা আদৌ স্কুল না থাকাটাকে শিক্ষার সুযোগের অভাবের কারণ বলে যে কথা বলা হয়েছে, তা আসলে কারণ নয় ফলাফল। কিন্তু কিসের ফল? কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শিক্ষা সংকোচন নীতিরই পরিণতি হিসাবে এই সমস্যা জন্ম নিয়েছে। সমগ্র আলোচনায় দেখা যাচ্ছে, শিক্ষা-স্বাস্থ্যের নিরিখে খাদ্যগ্রহণ, নারীর নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষার নিরিখে গোটা দেশের সভ্যতা এক ভয়ঙ্কর, কদর্য অবস্থায় পৌঁছেছে। কিন্তু কেন এমন হল?

নারী ও পুরুষ মিলেই সমাজ। বর্তমান সমাজ-সভ্যতার যে রূপ আমরা দেখছি, যে সমাজ-সভ্যতায় আজ আমরা বাস করছি, তা চিরকাল ছিল না। সমাজ পরিবর্তনের ধারায় এটা এসেছে, আবার তা একদিন থাকবেও না। আজকের সমাজ হল পুঁজিবাদী সমাজ, পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভিত্তির ওপর গড়ে-ওঠা সমাজ। এই সমাজে প্রতিষ্ঠিত সংবিধান, রাষ্ট্র, বিচার, আইন, রুচি-নীতি সবেরই লক্ষ্য হচ্ছে পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে — যার মূল উদ্দেশ্য ব্যক্তিমালিকের সর্বোচ্চ মুনাফা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে মালিকশ্রেণীকে-পুঁজিপতিশ্রেণীকে আরও শক্তিশালী করা — তাকে রক্ষা করা। মালিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা ও তাকে টিকিয়ে রাখার জন্যই মালিকশ্রেণীর রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে থাকে নানা দল, বহুদলীয় গণতন্ত্রের নামে। কংগ্রেস-বিজেপি এমনই দল। এরা মালিকশ্রেণীর চিহ্নিত দল। অন্যদিকে সি পি এমের মত দলগুলি মুখে বামপন্থা ও মার্কসবাদের বুলি আওড়ালেও কার্যত এই একই মালিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে মূলত দু'ধরনের দল থাকে, মালিকশ্রেণীর দল এবং শ্রমিকশ্রেণীর দল। মালিকশ্রেণীকে তুষ্ট করে শাসনক্ষমতায় যাওয়ার জন্য মালিকশ্রেণীর দলগুলির মধ্যে তীব্র লড়াই হয়। তাদের মধ্যে ভাঙ্গাগড়া হয়। কখনও কখনও নাম বদলিয়ে তাদের ভোলও পাল্টাতে হয় লোকঠকানোর জন্য। চোখ মেললেই এর ভুরিভুরি নজির দেখতে পাওয়া যাবে। পুঁজিপতিশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণী — পরস্পরবিরোধী এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত পুঁজিবাদী সমাজ বর্তমানে ইতিহাসের নিয়মে চরম প্রতিক্রিয়াশীল ও জনবিরোধী হয়ে পড়েছে এবং নজিরবিহীন বাজার সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলছে। ফলত পুঁজিপতিশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে নিয়মশাসিত এই শ্রেণীদ্বন্দ্ব ক্রমশঃ তীব্র, তীক্ষ্ণ ও সর্বব্যাপক হয়ে উঠছে। এই দ্বন্দ্বসংঘর্ষের পটভূমিতেই ব্যক্তি হিসাবে পুরুষ-নারী, পরিবার, দল ও সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্ত ঘটনাবলীর বিচার করতে হবে। সবই এই সংঘর্ষে আলোড়িত। ক্ষমতাসীন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করে চলেছে। কংগ্রেস তাই করেছে ও করছে। বর্তমানে বিজেপি সরকারও তাই করছে। বিজেপি হিন্দুত্ববাদী ও সংখ্যালঘু বিদ্বেষী হওয়ায় সমাজে নারী নির্যাতন ও হত্যা-ধর্ষণের ক্ষেত্রে তা একটা নতুন মাত্রা নিয়ে এসেছে। এইভাবে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে গোটা দেশের সাধারণ মানুষ আজ পুঁজিপতিশ্রেণীর নির্মম আক্রমণের মুখে। নারীর অস্তিত্ব আজ চরম বিপন্ন। শোষিতশ্রেণীর মধ্যেও অধিকতর শোষিত হল নারী।

ভারতবর্ষের পুঁজিবাদ নিজেই সাম্রাজ্যবাদী — সঙ্কটগ্রস্ত বিশ্বপুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ। দেশে দেশে বর্তমান স্তরে পুঁজিপতিশ্রেণী ও তাদের দল এবং তাদের সরকারগুলি তীব্র বাজার সঙ্কটের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে এবং এর মধ্যে থেকেও সর্বোচ্চ মুনাফা সুনিশ্চিত করতে আজ পারস্পরিক এক ধরনের সমঝোতায় পৌঁছেছে। এটাই বিশ্বায়ন। বিশ্বকে ভাগ-বাঁটোয়ারা করেছে নিজ নিজ পুঁজির শক্তির ভিত্তিতে। যদিও এই সমঝোতার মধ্যেও পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্ব, সাম্রাজ্যবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্ব তীব্র রূপ নিচ্ছে। এমনকি ক্রমাগত বাড়ছেও। সাময়িক সমঝোতার এই চেষ্টাটি ডব্লু টি ও'র মধ্য দিয়েই হয়েছে। চেষ্টা হচ্ছে অর্থনৈতিক যুদ্ধ যেন সামরিক দিক থেকে আবার একটা ব্যাপক বিশ্বযুদ্ধে পরিণত না হয়, যদিও যুদ্ধ অর্থনীতি ছাড়া আজকের সঙ্কটগ্রস্ত পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি বাঁচতে পারে না। এজন্যই এখানে সেখানে আঞ্চলিক যুদ্ধ চলছেই। টিকে থাকার জন্যই যুদ্ধ বা 'যুদ্ধ যুদ্ধ' ভাব তাদের দরকার — মূল সমস্যা থেকে জনসাধারণের দৃষ্টি আড়াল করা, জনগণের দেশাত্মবোধকে পুঁজিবাদের স্বার্থে ব্যবহার করা, এবং অর্থনীতির সামরিকীকরণ করে কৃত্রিমভাবে সঙ্কটগ্রস্ত পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রাখার জন্য। অর্থনীতির সঙ্কটই বিশ্বজোড়া যুদ্ধ-অর্থনীতি ও যুদ্ধ ব্যবসার জন্ম দিয়েছে। এই যুদ্ধের জন্য অনেক বেশি মূল্য দিতে হয় নারী ও শিশুদের — যুদ্ধজনিত সাধারণ সঙ্কট ছাড়াও প্রাণ দিয়ে, ইজ্জত দিয়ে, অবৈধ সন্তানের জন্ম দিয়ে এবং ভয়াবহ যৌন রোগের বিষ নিজ শরীরে বহন করে। এই যন্ত্রণার তীব্রতা, ভয়াবহতা, ব্যাপকতার কোনো তুলনাই হয় না। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের এই বাতাবরনের মধ্যেই নির্যাতিত শ্রমিকশ্রেণীর তথা সমাজে নারীর মূল্য নির্ধারিত হচ্ছে। নারীর সমস্যা শ্রমিকশ্রেণীর সামগ্রিক সমস্যার সঙ্গে মিলিয়েই বিচার করতে হবে। কৃষি, শিল্প — সংগঠিত ও অসংগঠিত — উভয় ক্ষেত্রে থেকেই বাড়ছে ছিন্নমূল নরনারীর স্রোত। '...এক স্থান থেকে অন্যান্য স্থানে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকদের (মাইগ্র্যান্ট লেবার) সংখ্যা ১৯৮১ সালের ২ কোটি ৩৪ লক্ষ থেকে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে জমি থেকে উচ্ছেদ ও কৃষিতে কাজের সুযোগ কমে আসার কারণে।' (দ্বিতীয় জাতীয় শ্রম কমিশনে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র স্মারকপত্র)

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের পর্বে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান কেমন? 'জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থা তাদের ৫৬তম সমীক্ষায় (২০০১-০২) বলেছে, 'শহরাঞ্চলের শ্রমিকদের মধ্যে মহিলাদের আনুপাতিক হার ৫৬তম সমীক্ষার সময়ে প্রতি হাজারে ২০১ থেকে কমে হয়েছে হাজারে ১৯৩।' আর একটু না বললে এই শ্রমিকবাহিনী (লেবার ফোর্স) সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে না। লক্ষ্য করুন — শ্রমিকবাহিনী বলতে এখানে কর্মে নিযুক্ত সকল শ্রমিক ও তার সাথে কর্মপ্রার্থীদেরও বোঝানো হয়েছে।

বিড়ি শ্রমিকদের বিশেষতঃ নারী শ্রমিকদের ওপর বল্‌গাহীন শোষণের কথা কে না জানে? আর হাজার হাজার সূতাকাটুনীদের (চরকায়) শ্রমিক বলা যাবে না। খাতাপত্রের কারসাজিতে তারা ব্যবসায়ী — তুলো কেনে, চরকা ভাড়া নেয়, সূতো বেচে। জোচ্চুরির ক্ল্যাসিক্যাল উদাহরণ!

আর চাকুরীপ্রার্থীর হিসেব বাদ দিয়ে কেবল যারা কর্মরত তাদের কথা ধরলে — ''মহিলা কর্মীর সংখ্যা ১০০০ জনে ১৯৫ থেকে ১০০০-এ ১৮৫ জনে নেমে আসে, ৫৬ রাউণ্ডে বেকারি ৩ শতাংশ থেকে ৫৭ রাউণ্ডে বেড়ে দাঁড়ায় ৯.১ শতাংশে। আর গ্রামের অবস্থাটা কী রকম? ....গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষেত্রে বেকারির হার ২০০০-০১ সালে ০.৫ থেকে ২০০১-০২ সালে ১.৫ শতাংশ হয়।

এবার দেখা যাক শিশুশ্রমিকদের দিকে। ''.....৫ থেকে ১৪ বছর বয়সী যে মেয়েরা স্কুলে যাওয়ার পরিবর্তে খাটতে যায়, তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। শহরাঞ্চলে ১৪ বছরের নিচে কাজ করা মেয়েদের সংখ্যা প্রতি হাজারে ২১ (৫৬ রাউণ্ড সমীক্ষার সময়) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হাজারে ৩৫ হয়েছে (৫৭ রাউণ্ড সমীক্ষার সময়), গ্রামাঞ্চলে এই অনুপাত ৩৯ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৫৩।

বিশ্বায়ন-উদারীকরণের ফল হিসাবে স্বেচ্ছাঅবসর ও ছাঁটাই বাড়ার ফলে যেমন এ দেখা যাচ্ছে — তেমনি দারিদ্র্যের কারণে সস্তা শ্রমের যোগানদার হিসাবে দেখা যাচ্ছে বালিকাদেরও। তথাকথিত সভ্যতায় মা-বোন-কন্যারা হল জ্বালানীর মত। (২৯ ডিসেম্বর, '০৩ স্টেটসম্যান)। '৮০ দশক থেকে উদারনীতি চালু হওয়ার পর ভারতবর্ষের উন্নয়নের যে ধারা চলছে '৯১-এ তার আনুষ্ঠানিক রূপায়ণ হয়েছে। ১৯৮১ সালে '৬১ সালের তুলনায় ১ কোটি ৪৫ লক্ষ ২৬ হাজার মহিলা চাকুরীজীবীর সংখ্যা কমেছে। (সূত্র ঃ সেন্সাস, নভঃ ৪-১১-৮৯, ইকনমিক এন্ড পলিটিক্যাল উইকলি)

পুঁজিবাদী সঙ্কটের কারণে ১৯৬১-৭১ সময়ে নারী-পুরুষ মিলিয়ে চাকুরীজীবীর সংখ্যা কমে গিয়েছিল ৭৯ লাখ ৩০ হাজার। ১৯৯১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট এবং ১৯৮৭তে চাকুরীজীবী মহিলাদের সম্পর্কে ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে'র রিপোর্ট হল ৮৬.৬ শতাংশ মহিলা স্বনির্ভর উদ্যোগে কাজ করেন। স্থায়ী বেতনভুক মহিলা ৮.৩ শতাংশ, সাময়িক বেতনভুক ৩৮.৬ শতাংশ। (সূত্র ঃ নিউজ লেটার, অক্টোবর-নভেঃ ১৯৯৫ জাতীয় শ্রম প্রতিষ্ঠান)

সারা দেশে ৫১.৫৬ শতাংশ পুরুষদের এবং নারীদের ২২.৭৩ শতাংশ হলেন 'কর্মী', যারা দেশের অর্থনীতিতে নানাভাবে উৎপাদনমূলক কাজে নিযুক্ত থাকে। এর মধ্যে সাত দিনের কম কাজে থাকে যারা তারা প্রান্তিক কর্মী। নারী কর্মীদের ৬.২৫ শতাংশ হল প্রান্তিক, পুরুষের প্রায় ৬ গুণ। নারী কর্মীদের ৯৬ শতাংশ আবার অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত, যা প্রধানতঃ কৃষি। মোট গ্রামীণ কর্মীদের ৮০ শতাংশ কৃষিক্ষেত্রে যুক্ত। জাতীয় আয়ের অর্ধেকই আসে এখান থেকে। এই বিপুল নারী কর্মীবাহিনীর ৮৭.০১ শতাংশ কৃষি উৎপাদনের সাথে যুক্ত। এক্ষেত্রে নারী দিনমজুর ৪৮.৪৩ শতাংশ, পুরুষের ২৬ গুণের বেশী।

শ্রমের এই অবদানের স্বীকৃতি কোথায় কতটুকুই বা আছে?

১৯৮১-৯১ সময়টাতে নারীশ্রমিকদের হার ৫৫শতাংশ। অধিকাংশই কিন্তু কাজ করে বছরে ৬ মাসের কম। তপসিলিদের মধ্যে নারী শ্রমিকের হার ৪৬.১৬ শতাংশ।

এই শ্রমিকদের মজুরি কেমন? এ প্রসঙ্গে শুধু আমরা একটি রিপোর্টই উল্লেখ করব। নারীদের অবস্থান সম্পর্কে সমীক্ষা করার কমিটি বলছে — মজুরি বৈষম্য কেবল নারী ও পুরুষের মধ্যেই নয়, তপশিলি ও তপশিলি নয় — এই দুই ধরনের শ্রমিকদের মধ্যেও বৈষম্য ব্যাপকভাবে বিরাজ করছে।

নিম্নবর্গের নারীরাই বেশি শ্রম দেন — নিপীড়িত হন বেশি। ঘনিষ্ঠভাবে কৃষিকাজে যুক্ত থাকলেও নীতি নির্ধারণে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রটিতে নারীর অবস্থান শূন্য। শ্রীমতি রাজমোহিনী শেঠি তার সমীক্ষায় দেখিয়েছেন — কৃষি উৎপাদনের সাথে মহিলাদের সংযুক্তি ঘটে গেলেও, পণ্যের উৎপাদন ও বণ্টনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে মহিলাদের সামাজিক ভূমিকা আগেও যা ছিল, এখনও সেটাই আছে, তার কোন পরিবর্তন হয়নি। যদিও একই কথা খাটে পুরুষ মজুরের ক্ষেত্রেও। যন্ত্রশিল্পের অগ্রগতির সাথে সাথে উৎপাদনে মানুষের শ্রম কমছে। শ্রমিকের সংখ্যা কমছে। পুরুষদের তুলনায় নারীর আধুনিক শিক্ষায় পশ্চাদগামীতার দরুন আধুনিক শিল্পের বিকাশের ধারায় — ক্রমাগত নারী ছিটকে পড়েছে উৎপাদন প্রক্রিয়ার বাইরে। কর্মরতদেরও মজুরির ক্ষেত্রে আই এল ও নির্ধারিত ব্যাখ্যার বিকৃতি ঘটিয়ে মজুরি কম দিয়ে বাড়তি শোষণ করা হচ্ছে নারী শ্রমিককে। বহু সেক্টরে নারী শ্রমিক নিয়োগ বন্ধও করে দেওয়া হয়েছে। রেকর্ড পরিমাণ বেকারীত্বের জন্মদাতা পুঁজিনির্ভর অর্থনীতি (capital intensive) সংগঠিত ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর উৎপাদন ক্ষমতা যেমন কাজে লাগাতে পারছে না — ছাঁটাই করছে, কর্মক্ষম নারী-পুরুষকে কর্মে নিয়োগ করে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যুক্ত করতেও অপারগ হচ্ছে। পুঁজিবাদী আধুনিকীকরণ-বিশ্বায়নের এই নীতির ফলে সমগ্র দেশের উৎপাদকশ্রেণী উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। বাড়ছে বিচ্ছিন্নতা। এই বাহিনীর অর্ধেকই নারী। সেই অর্থে নারীও বিচ্ছিন্ন হচ্ছে উৎপাদনের প্রক্রিয়া থেকে। নারীর আত্মনির্ভরতা স্বাধিকার তবে কোন ভিত্তির উপর দাঁড়াবে?

(চলবে)

রাজ্য বাজেটে পরিসংখ্যানের তামাশা

একের পাতার পর

৩,৩৭,০০০ বেশি। তাঁদের ''বিকল্প অর্থনীতিতে'' চাকরি হয়েছে কেমন? এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে গত ১০ বছরে গড়ে বছরে ৯০০০ জনের চাকরি হয়েছে। (সূত্র প্রতিদিন ১৫.৫.০২)। এসব প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী ঢোকেননি। মোট জনসংখ্যার তুলনায় বেকারের শতকরা হার ভারতে ও পশ্চিমবঙ্গে কত তা ঘুণাক্ষরেও বলেননি। আমরা জানি, প্রকৃত বেকার সংখ্যা সরকারি নথিতে থাকে না। প্রকৃত বেকার সংখ্যা অনেক বেশি। সেটা আপাতত বাদ রেখে দু'ক্ষেত্রেই নথিভুক্ত বেকার সংখ্যাকে জনসংখ্যার সঙ্গে তুলনা করলে কী বের হত?

দেশের জনসংখ্যা ১০০ কোটি, নথিভুক্ত বেকার ৪ কোটির কিছু বেশি, অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ৪ শতাংশের কিছু বেশি বেকার।

পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যা ৮,০২,২১,১৭১ জন, বেকার ৬৬,৬৭,০০০ অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ৮.৩১ শতাংশ বেকার। অর্থাৎ যেভাবে উপস্থাপনা করলে অসুবিধা, মন্ত্রী সেটা এড়িয়ে গিয়েছেন সুকৌশলে।

পরিকল্পনা ব্যয়

এমন আর একটি নজির হল পরিকল্পনা খাতে ব্যয়ের হিসাব। যে-কোন বাজেটেই সরকারি খরচের দু'টি খাত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একটি হল পরিকল্পনা খাত, যে খাতে বরাদ্দ টাকার দ্বারা উন্নয়নমূলক কাজগুলি করা হয়। অপরটি হল মূলধনী খাত, যে খাতে বরাদ্দ টাকায় সরকার স্থায়ী সম্পদ, কলকারখানা বানায়।

পরিকল্পনা ব্যয় সম্পর্কে অর্থমন্ত্রী বলেছেন — ''...এই প্রতিকূলতার মধ্যেও সম্ভব হয়েছে পরিকল্পনা ব্যয়কে ৩,০৬৫ কোটি টাকাতে উন্নীত করা, যা গত বছরের পরিকল্পনা ব্যয়ের (২,৬৭৩ কোটি টাকা) প্রায় ১৫ শতাংশ বেশি।'' অর্থাৎ অর্থমন্ত্রী দেখাচ্ছেন — প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও উন্নয়নমূলক কাজে তাঁরা ১৫ শতাংশ ব্যয় বাড়াচ্ছেন। কত ছিল পরিকল্পনা ব্যয় গত বছর? অর্থমন্ত্রী বলেছেন, ২,৬৭৩ কোটি টাকা। বেকায়দা অবস্থা এড়াতে ঘুণাক্ষরেও তিনি গত বছরের বাজেটে কী বলেছিলেন তা স্মরণ করেননি। তিনি বলেছিলেন — ''বর্তমান আর্থিক বছরে সংশোধিত পরিকল্পনা ব্যয় ৩৭৯৪ কোটি টাকা থেকে আগামী বছর ৩৮৯৪ কোটি টাকাতে উন্নীত হবে।'' (সূত্র ঃ বাজেট ভাষণ ২০০৩-২০০৪)। এর অর্থ দাঁড়ায়, হয় অর্থমন্ত্রী নির্জলা মিথ্যা বলেছেন, না হয় গত বছর ৩৮৯৪ কোটি টাকা পরিকল্পনা ব্যয়বরাদ্দ ঘোষণা করে বাস্তবে তা কমিয়ে ২,৬৭৩ কোটি টাকা করেছেন। অর্থাৎ, গত বছরের পরিকল্পনা ব্যয় যে ১২২১ কোটি টাকা ছাঁটাই করেছেন সেটা অর্থমন্ত্রী চেপে গিয়েছেন।

রাজ্যের স্কুল-হাসপাতালের ছাদ থেকে চাঙড় ভেঙে পড়ছে, স্কুল চলছে গাছতলায়। ঘর নেই, বেঞ্চি-টেবিল-বোর্ড নেই। হাসপাতাল উন্নয়নের নামে বেসরকারি হাতে তাঁরা তুলে দিচ্ছেন হাসপাতালের খাদ্য সরবরাহ, এক্সরে, প্যাথোলজি। কারণ নাকি উন্নয়নের টাকা নেই। বাজেটে কিন্তু তার স্বীকৃতি নেই। বাস্তবে সরকারি উদ্যোগে উন্নয়ন বন্ধ করে বাজেট ভাষণে পরিকল্পনা ব্যয়বৃদ্ধির ধোঁকা দিচ্ছেন। তাহলে প্রশ্ন এ বছরের ৩০৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দের নিশ্চয়তা কিছু আছে কি? না, নেই। জোচ্চোরের বাড়ি ফলার, না আঁচালে বিশ্বাস নেই।

কৃষি উৎপাদন

কৃষিক্ষেত্রে, খাদ্যশস্য উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধিকে অর্থমন্ত্রী জোরালোভাবে সাফল্যের নজির হিসাবে দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন — ''খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৭৬-৭৭ সালে ৭৪ লক্ষ টন থেকে লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে গত বছরে (২০০২-০৩) পৌঁছায় ১৫৫ লক্ষ টনে এবং এ বছরে (২০০৩-০৪) তা আরও বৃদ্ধি পেয়ে পৌঁছবে অনুমিত ১৬২ লক্ষ টনে। সাধারণভাবে মনে হবে উৎপাদন তো বাড়ছে, কাজেই ভালোই তো! কিন্তু গত বছরের বাজেট ভাষণে অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন, ২০০১-০২ সালেই খাদ্যশস্য উৎপাদন ১৬৫ লক্ষ টনে পৌঁছেছিল। এতেই পরিষ্কার কেন অর্থমন্ত্রী গত বছরের সঙ্গে তুলনা না করে ২৬ বছর আগেকার উৎপাদনের সঙ্গে তুলনা করে বসলেন। আসলে ২০০১-০২ এর উৎপাদনের (১৬৫ লক্ষ টন) সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে ২০০২-০৩ সালে উৎপাদন (১৫৫ লক্ষ টন) ১০ লক্ষ টন কমেছিল। অসুবিধা বুঝেই এক্ষেত্রে আগের বছরের বাজেট ভাষণের তথ্যটি তিনি এড়িয়ে গিয়েছেন। এতো গেল তথ্যের কারচুপি। কিন্তু কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ফল চাষীর জীবনে কী দাঁড়াচ্ছে? একশ্রেণীর বৃহৎ কৃষি ব্যবসায়ী ফুলে ফেঁপে উঠছে, আর প্রকৃত চাষী ফসলের দাম না পেয়ে ঋণের ফাঁসে পড়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছে, আত্মহত্যাও করছে। এসব মৃত্যুকে 'ঋণের দায়ে নয়' প্রমাণ করতে সরকারকে নতুন করে মিথ্যার জাল বুনতে হচ্ছে।

অর্থমন্ত্রী বলেছেন — ''এবছর আলুর উৎপাদন ৭৫ লক্ষ টন হবে বলে অনুমিত হয়েছে। এক্ষেত্রে সমগ্র দেশে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান দ্বিতীয় স্থানে।'' কিন্তু উৎপাদন বাড়ছে না কমছে, তার হদিশ দেননি অর্থমন্ত্রী। কেন? কারণ তিনিই বলেছিলেন গত বছর আলুর উৎপাদন ছিল ৭৮.২ লক্ষ টন।

হলদিয়া

এমন দৃষ্টান্ত গোটা বক্তৃতা জুড়ে। অর্থমন্ত্রী শিল্পে অগ্রগতির রঙিন ছবি দেখিয়ে বলেছেন — ''বর্তমানে হলদিয়া পেট্রো-রসায়ন প্রকল্পে ৬১৫টি অনুসারী শিল্প স্থাপিত হয়েছে, তার মধ্যে ৭০টি মাঝারি, ৩৪১টি হয়েছে ক্ষুদ্রশিল্পে।'' গত বছর এই অসীমবাবুই বলেছিলেন — ''বর্তমানে হলদিয়া পেট্রো-রসায়ন প্রকল্পে ৫৩৭টি অনুসারী শিল্প গড়ে উঠেছে তার মধ্যে ৩৪টি মাঝারি, ৪৯৯টি ক্ষুদ্র শিল্পে।'' অর্থাৎ এক বছরে অনুসারী শিল্প বেড়েছে (৬১৫-৫৩৭) ৭৮টি, মাঝারি শিল্প ৩৪ থেকে ৭০ হয়েছে, কিন্তু ক্ষুদ্র শিল্প ৪৯৯ থেকে ৩৪১ হয়ে গেল কী করে? ২৫৮টি ক্ষুদ্র শিল্প কোথায় গেল? উঠে গেল নাকি? সত্যিই যে কী হয়েছে তা অর্থমন্ত্রী জানেন তো? নাকি সব হিসাবই মহাকরণের রসুইঘরে তৈরি?

ঋণ

তবে দুটো ব্যাপার নিশ্চিত। এক সরকারি ঋণ বাড়ছে। গত বছরের বাজেটে সরকার বলেছিল ৫২৩৮ কোটি টাকা ঋণ নেবে। সংশোধিত হিসাবে গত বছর ঋণ নিয়েছে ৮১০৩ কোটি টাকা। এবছর ৮০৭৭ কোটি টাকা ঋণ তাঁরা নেবেন বলেছেন, তা কত বাড়বে তা জানা যাবে সামনের বছর। ব্যয়সংকোচের প্রশ্নে অসীমবাবু বলেছেন সংযমী আচরণ করা হবে, যদিও মন্ত্রীদের গাড়ির তেলখরচও তিনি কমাতে পারেননি। গত বাজেটের ব্যয়সংকোচের প্রতিশ্রুতি আদৌ রক্ষিত হয়নি, সরকারের বাড়তি খরচ হয়েছে ৫২১১ কোটি টাকা। অসীমবাবুর ধনুর্ভঙ্গ পণ এবার তাঁরা খরচ কমাবেন কর্মচারীদের মূল বেতন ও অবসরকালীন ভাতাবৃদ্ধি সীমাবদ্ধ রেখে এবং বিদ্যুৎ পরিবহন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভরতুকি কমিয়ে এনে। বাকী প্রতিশ্রুতির পরিণতি যাই হোক, শেষেরটা তিনি যে করবেনই, তা বলে দেওয়া যায়।

কথিত আছে যাদুবিদ্যার জনক ছিলেন ভোজরাজ। তাঁর রাজত্ব কোথায় ছিল সঠিক বলা যায় না, অনুমান তিনি বঙ্গদেশেই ছিলেন। তাঁর একটি অদ্ভুত যাদু ছিল, একটি দড়ি শূন্যে ছুঁড়ে সেটা বেয়ে নাকি উঠতে পারতেন। নিরালম্ব দড়িতে আরোহণের এই কিংবদন্তি যাদুর নাম 'ইন্ডিয়ান রোপ ট্রিক'। এ যাবৎ কোন যাদুকর এই ভোজবাজী আর দেখাতে পারেননি। অসীমবাবুর পরিসংখ্যান ভোজরাজের দড়ির মতোই নিরালম্ব। কীসের ভিত্তিতে এসব তিনি বলছেন তার হদিস নেই। শুধু তাতে চড়েই তিনি দেখাচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গ ভারতে সবার সেরা, নয়ত সেরা রাজ্যগুলির একটা। দর্শন বলে, সকল সত্যেরই সীমা আছে, কিন্তু মিথ্যা যে অসীম হতে পারে রাজ্যের বাজেট তার অকাট্য দৃষ্টান্ত।

(তথ্যসূত্র: বিভিন্ন বছরের বাজেট বক্তৃতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার)

কোথায় গেল মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ?

একের পাতার পর

যখন টমেটো ৬ টাকা থেকে ৮ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে, প্রক্রিয়াকরণের পর বড় বড় কোম্পানি যখন টমেটো সস বেচছে ২৫০/৩০০ টাকা কিলো দরে, তখন চাষীরা কেন ২৫ পয়সার বেশি দাম পাচ্ছেন না বা মাঝখানে কারা, কীভাবে এই অর্থ আত্মসাৎ করছে — তার উত্তর দেওয়ার জন্য কোন মন্ত্রীকেই পাওয়া যাবে না। রাজ্যে বামফ্রন্টের রাজত্বের ২৬ বছরের রেকর্ড গড়ে উঠলেও কেন চাষীদের স্বার্থে এইসব পচনশীল সব্জি সংরক্ষণের ও বিপণনের সরকারি কোনও ব্যবস্থাই গড়ে তোলা হল না, তার কোনও ব্যাখ্যা ভোটের প্রচারের সময় বামফ্রন্টের নেতা-মন্ত্রীরা দিচ্ছেন কি? মুখ্যমন্ত্রীর পাঁচটি অ্যাগ্রো এক্সপোর্টার্স জোন তৈরির ঘোষণা কেন এই বিপন্ন চাষীদের কোনও কাজেই লাগেনা, তার উত্তর মুখ্যমন্ত্রী দেবেন কি? নাকি, বামপন্থার তক্‌মাধারী, উন্নততর বামফ্রন্টের প্রবক্তা মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর দল সাধারণ চাষীদের স্বার্থ এবং বড় কৃষি-ব্যবসায়ীদের স্বার্থ একাকার করে ফেলেছেন ?

অগ্নিযুগের বিপ্লবী

ডাঃ কে পি ঘোষের জীবনাবসান

অগ্নিযুগের বিপ্লবী, শহীদ সূর্য সেনের অনুগামী, আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানী, বামপন্থী আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের প্রাক্তন কাউন্সিলর ও সমাজসেবী ডাঃ কে পি ঘোষ ১৭ মার্চ রাত ১টায় কলকাতার ডিভাইন নার্সিং হোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে তিনি কংগ্রেস সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল হন এবং বামপন্থাকে তাঁর জীবনের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন।

তিনি ৭ বার কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কাউন্সিলর হিসাবে নির্বাচিত হ'ন। ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট সরকার জনবিরোধী অ-বামনীতি গ্রহণ করলে ডাঃ কে পি ঘোষ তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হন। এর ফলে তিনি সরকারি বামপন্থার বিরাগভাজন হন। সরকারি পদ ও নামের মোহ থেকে মুক্ত ডাঃ ঘোষ সারা জীবন জনসাধারণের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন এবং ফ্রি মেডিকেল সার্ভিস, ফ্রি-কোচিং, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য আন্দোলন, সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলন, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, বিপ্লবী ও মনীষী স্মরণসহ নানা সামাজিক কাজে যুক্ত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে গরিব ও সাধারণ মানুষ একজন সত্যিকারের মানবদরদীকে হারাল।

১৮ মার্চ তাঁর মরদেহে মাল্যার্পণ করে শ্রদ্ধা জানান কমরেড প্রতিভা মুখার্জী (এস ইউ সি আই), বিধান চ্যাটার্জী (ইউ টি ইউ সি-এল এস), শক্তিমান ঘোষ (হকার সংগ্রাম সমিতি) সহ বহু সমাজসেবী সংস্থা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। এছাড়াও তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানান অল ইন্ডিয়া ডি এস ও, ডি ওয়াই ও, সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতি, জনবসতি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি, অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি, অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরাম, সারা বাংলা কমিউনাল হারমনি কমিটি, পিনাকী মেমোরিয়াল ফ্রি কোচিং সেন্টার, সারা বাংলা নজরুল জন্মশতবর্ষ কমিটি, সারা বাংলা নেতাজী জন্মশতবর্ষ কমিটি, সারা বাংলা ক্ষুদিরাম মৃত্যুশতবর্ষ কমিটি, শহীদ আসফাকউল্লা খান ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প সহ অনেক সংস্থার প্রতিনিধিরা।

ঐদিন কেওড়াতলা শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

২০ মার্চ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দিবসে রাজ্যে রাজ্যে বিক্ষোভ

(বাঁ দিকে) হায়দ্রাবাদে যৌথ মিছিল

(নিচে বাঁ দিকে) ত্রিবান্দ্রমে মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছেন এস. কোশলা রামদাস, অধ্যাপক এন এ করিম ও বি রাজাগোপাল

(নিচে ডান দিকে) কলকাতায় এসপ্ল্যানেডে বিক্ষোভ সমাবেশে বুশের কুশপুতুলে অগ্নিসংযোগ করছেন অল ইণ্ডিয়া অ্যান্টি-ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের সহসভাপতি মানিক মুখার্জী

কৃষক ও খেতমজুর সম্মেলন

ফালাকাটা

সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের জলপাইগুড়ি জেলার ফালাকাটা ব্লক প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২৯ ফেব্রুয়ারি। সম্মেলনের সূচনা করেন রাজ্যসভার প্রাক্তন সদস্য বিশিষ্ট কৃষকনেতা, সম্মেলনের প্রধান অতিথি কমরেড দেবেন বর্মন। সম্মেলনের উদ্বোধন করে স্বাগত ভাষণ দেন এস ইউ সি আই ফালাকাটা লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড পীযূষকান্তি শর্মা। সম্মেলনে মূল প্রস্তাব পাঠ করেন কমরেড চন্দন উরাও। বক্তব্য রাখেন কমরেডস্ হরিশ বর্মন, রাখাল দাস ও অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দ। সম্মেলনের প্রধান বক্তা ছিলেন এস ইউ সি আই কোচবিহার জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের জেলা সভাপতি কমরেড রুহল আমিন। ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন ডি এস ও এবং ডি ওয়াই ও-র পক্ষ থেকে কমরেড নূর ইসলাম ও দেবু সাহা বক্তব্য রাখেন। বক্তারা বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের নীতি মেনে বহুজাতিক কোম্পানিকে কৃষিক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ করে দিচ্ছে এবং পঞ্চায়েতে বিপুল ট্যাক্স চাপাচ্ছে, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বিদ্যুতের ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি করছে। এর বিরুদ্ধে কৃষক ও খেতমজুর সংগঠন আন্দোলন গড়ে তুলছে। এই সংগঠনের শক্তিবৃদ্ধির আহ্বান জানান বক্তারা। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কমরেড সুবোধ ভৌমিক।

সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে কমরেডস্ সুবোধ ভৌমিককে সভাপতি, হরিশ বর্মনকে সম্পাদক করে কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের ফালাকাটা ব্লক কমিটি গঠন করা হয়।

জগদল্লা

সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের বাঁকুড়া জেলার জগদল্লা আঞ্চলিক সম্মেলন ২৯ ফেব্রুয়ারি গোড়াবাড়ি প্রাথমিক স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। প্রকাশ্য সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কমরেড বাসুদেব গরাই। সভার প্রধান বক্তা এস ইউ সি আই বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক কমরেড জয়দেব পাল তাঁর বক্তব্যে কৃষক ও খেতমজুরদের জীবনের সমস্যার কারণ যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তা তুলে ধরে বলেন, সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের নীতি বিজেপি-কংগ্রেস সরকারগুলি যেমন কার্যকরী করছে, এ রাজ্যের সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারও করছে। তিনি বলেন, কৃষক ও খেতমজুরদের বাঁচার একমাত্র পথ সঠিক সংগ্রামী সংগঠনের নেতৃত্বে দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তোলা। সেই সংগঠন 'সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠন'। তিনি এই সংগঠনকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সমাবেশে কমরেড ভীম সীটও বক্তব্য রাখেন।

ভ্রম সংশোধন

গোধরায় ট্রেনে আগুন লাগানো সম্পর্কে ফরেনসিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'আগুন দেওয়া হয় কামরার ভিতর থেকে, বাইরে থেকে নয়'। গণদাবীর গত সংখ্যায় বিষয়টি ভুল ছাপা হয়েছিল।

সরকারি চাকরি হ্রাস সম্পর্কে সঠিক তথ্য হচ্ছে — সংগঠিত মোট শিল্পসংস্থার সংখ্যা ২ লক্ষ ৮৭ হাজার। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের সংখ্যা ১ লক্ষ ৭২ হাজার। বেসরকারি সংখ্যা ১ লক্ষ ১৫ হাজার। গত সংখ্যায় এই তথ্যে কিছু ভুল ছাপা হয়েছিল।

এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

— সঃগঃ

গণদাবী
স্ট্যালিন
মৃত্যুবার্ষিকী
বিশেষ সংখ্যা
প্রকাশিত হয়েছে
মূল্য ঃ পাঁচ টাকা

১৫ মার্চ ক্রেতা সুরক্ষা দিবসে অল ইন্ডিয়া ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের পদযাত্রা

ছাত্র সংসদ নির্বাচন

প্রেসিডেন্সি কলেজে এস এফ আই পরাজিত

১৯ ডিসেম্বর, বিকেল সাড়ে চারটে। সবেমাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রসংসদ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হয়েছে। কলেজ স্ট্রীট পাড়ার বই দোকানের বহু মানুষ রাস্তায় নেমে, আবির মাখিয়ে, আলিঙ্গন করে অভিনন্দন জানালেন এ আই ডি এস ও-আই সি-পি ডি এস এফ জোটের ছাত্রনেতাদের, যারা এস এফ আই-কে পরাস্ত করে এবারের জয় ছিনিয়ে এনেছে। কলেজের ছাত্রসংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গত কয়েকদিন ধরে ছিল টানটান উত্তেজনা। ১৯ ডিসেম্বর সকাল থেকে প্রচুর পুলিশ সহ বহু সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের উপস্থিতি এবং এ আই ডি এস ও-আই সি-পি ডি এস এফ জোটের নেতৃত্বের বলিষ্ঠ উপস্থিতির কারণে এস এফ আই'র গুণ্ডাবাহিনীর দাপট ছিল অন্যান্য দিনের তুলনায় কম। এই বাহিনীর প্রবল হুমকিতে ভয় পেয়ে এবারেও একজন সাধারণ নির্বাচিত প্রতিনিধি ভোট দিতে পারেনি। পাশাপাশি আর একজন নির্বাচিত ছাত্র যাকে এই গুণ্ডাবাহিনী ভয় দেখিয়ে বলেছিল, 'কিছুদিন আগে তুই তোর বাবাকে হারিয়েছিস, এবার ভোট দিতে এলে তোর মা'কে হারাতে হবে' — সে কিন্তু সাহসের সাথে এর মোকাবিলা করেছে। এস এফ আই-এর এই ঘৃণ্য রাজনীতি পশ্চিমবাংলার মানুষের কাছে আজ খুবই পরিচিত। ঠিক এভাবেই ভয় দেখিয়ে, টাকার টোপ দিয়ে দু'বছর আগে এরা প্রেসিডেন্সির ইউনিয়ন দখল করেছিল। এবারেও এরা প্রচার তুলেছিল, এ আই ডি এস ও-আই সি-পি ডি এস এফ জোট আসলে দক্ষিণপন্থী-সাম্প্রদায়িক জোট। গোয়েবলস্‌রা মরেনি তা আবারও প্রমাণিত হল এই মিথ্যা প্রচারের মধ্য দিয়ে।

যাই হোক, সমস্ত প্রতিকূলতাকে দু'পায়ে মাড়িয়ে এই জোটকে জয়ী করার জন্য এবং ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদে এ আই ডি এস ও প্রার্থীকে নির্বাচিত করার জন্য এ আই ডি এস ও'র জেলা নেতৃত্ব কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিনন্দন এবং আগামী দিনে শিক্ষার স্বার্থে আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি এস ও জয়ী

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শাখার ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ভি সি (ভাইস চেয়ারম্যান) পদে এ আই ডি এস ও প্রার্থী এবার জয়ী হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পানীয় জল, অস্বাভাবিক হারে আবার ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত, সান্ধ্যবিভাগ তুলে দেওয়ার এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত ক্যান্টিন-এর বেসরকারীকরণের ছাত্রস্বার্থবিরোধী পরিকল্পনার বিরুদ্ধে এ আই ডি এস ও'র নেতৃত্বে আন্দোলন চলে আসছে। এ আই ডি এস ও'র জেলা নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এই জয়ের জন্য ছাত্রছাত্রীদের ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি যে দাবিগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন চলছে তার সমর্থনে ছাত্রসমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়েছে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net